ইউনিট ৬: উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত
Importance of Education on Development: Bangladesh Perspective

ভূমিকা

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাকে সর্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ধ্রুপদী (Classical) অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ড মিল, আলফ্রেড মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিতে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। কাল মার্কস-এর মতে শিক্ষা অর্জন শ্রমজীবিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং দক্ষতা আনুপাতিক হারে উচ্চতর মূল্য/উপকারিতা (values) সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। উল্লিখিত অর্থনীতিবিদগণ শিক্ষাকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, কাজের উদ্দীপনা ও নিপুণতা/দক্ষতা বৃদ্ধির উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে স্বীকার করা হয়। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এতে মানুষের নিয়োজন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয়, সঞ্চয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ কৃষি উৎপাদনে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার ব্যাপক অবদান রয়েছে। সর্বোপরি পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এই ইউনিটে ১২টি পাঠ রয়েছে। এই পাঠগুলো হলো:

পাঠ - ৬.১ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা
পাঠ - ৬.২ এশিয়ার উন্নত দেশসমূহের উন্নয়নে শিক্ষার অবদান
পাঠ - ৬.৩ শিক্ষা এবং দারিদ্র্য উপশম/লাঘব করা/বিমোচন করা
পাঠ - ৬.৪ শিক্ষা-নিয়োজন এবং অনিয়োজন
পাঠ - ৬.৫ শিক্ষা-আয় এবং ব্যয়
পাঠ - ৬.৬ শিক্ষা-সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ
পাঠ - ৬.৭ শিক্ষা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন
পাঠ - ৬.৮ শিক্ষা এবং কৃষি উৎপাদন/উন্নয়ন
পাঠ - ৬.৯ শিক্ষা এবং নারীদের উন্নয়ন/ক্ষমতায়ন
পাঠ - ৬.১০ শিক্ষা এবং পুনরুৎপাদনশীল আচরণের পরিবর্তন
পাঠ - ৬.১১ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষার প্রভাব
পাঠ - ৬.১২ শিক্ষা, গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

পাঠ ৬.১: শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা
Education and Economic Development Review

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা দু'টি বর্ণনা করতে পারবেন;
- উন্নয়নে শিক্ষার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- উন্নত পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নে শিক্ষার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার মাধ্যমে সাধিত বহুমাত্রিক উন্নয়ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

... যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তিকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা–অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে। ... (*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে পত্র, মস্কো, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনায় শোয়াইব জিবরান, সংবেদ, ঢাকা ২০১২, পৃ. ১৪৬*)

শিক্ষা

শিক্ষার ধারণার ক্ষেত্রে শিক্ষাচিন্তাবিদদের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইংরেজি 'Education' শব্দটি ল্যাটিন Educare শব্দ বা 'Educere' থেকে এসেছে বলে অনেকে ধারণা পোষণ করেছেন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন ও বাস্তবায়ন বোঝায়। শেষোক্ত শব্দে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীদের লালন পালন করা বা প্রশিক্ষিত করা বোঝায়। আবার বাংলায় শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত ধাতু 'শাস্' থেকে এসেছে। শাব্দিক অর্থে 'শাস্' ধাতু কঠোর কাঠামোগত পরিচালন মূলক উদ্দেশ্যের অধিকারী হলেও ব্যাপক অর্থে তা যথাযথ নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন অর্থে প্রয়োগ করা যায়।" (*মালেক ও অন্যান্য, ২০০৭, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা. পৃ.* ২)

দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজি বা ল্যাটিন এবং সংস্কৃত বা বাংলায় শিক্ষা বলতে ব্যক্তির সহজাত বুদ্ধি বা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও পরিচালনকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তির মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন ও আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে ধাবিত করাই হলো শিক্ষা। শিক্ষা সংক্রান্ত কোন ধারণাই চিরস্থায়ী হতে পারে না। সময়ের পরিবর্তন, সমাজের চাহিদা, মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির নিরিখে শিক্ষার ধারণা বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিক্ষার ন্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা সম্পর্কেও শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গুনার মিরডালের মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো- সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা" (*Meier G. M, 1995, Leading Issues in Economic Development, Sixth Edition, p. 7*)। বল্ডউইন-এর মতে উন্নয়ন হলো "মাথাপিছু আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধি" (*ড. আবু মাহমুদ, অনুবাদ ড. আবুল বারকাত, ১৯৮৫, উন্নয়ন উচ্ছ্বাস ও তৃতীয় বিশ্ব, পৃ.* ১৬)। মেয়ার মনে করেন, "মানুষের প্রকৃত আয় অন্ততপক্ষে দুই থেকে তিন দশক অব্যাহতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায় (*Meier G. M, 1995, p. 7*)। হিরসম্যান

উন্নয়নকে দেখেছেন "দারিদ্র্যের একটি মুখাবয়ব (Feature) হিসেবে, যখন প্রবৃদ্ধি ধনীদের লক্ষণ, অন্যদিকে নাটার উন্নয়নকে বর্ণনা করেছেন প্রচ্ছন্ন উৎপাদনের প্রসারণ হিসেবে, শ্যুমপিটার উন্নয়নকে বর্ণনা করেছেন, "বাহ্যিক (নিজস্ব সঞ্চয় নয় বরং ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল হওয়া) উদ্দীপনার ফলশ্রুতি হিসেবে" (*ড. আবু মাহমুদ, অনুবাদ ড. আবুল বারকাত, ১৯৮৫, উন্নয়ন উচ্ছ্বাস ও তৃতীয় বিশ্ব, পৃ. ১৭-১৮*)। রায় উন্নয়নের ধারণাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন, ''এটা সম্ভবত: সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য যে, উন্নয়ন শুধু আয়ের বিষয় নয়, যদিও আয়ের (অধিকতর সাধারণভাবে অর্থনৈতিক সম্পদ) এক্ষেত্রে একটি মহান ভূমিকা রয়েছে। ... উন্নয়ন হলো দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণ: এটা হলো প্রত্যাশিত আয়ুর বৃদ্ধি, স্যানিটেশন, পরিস্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবাসমূহে প্রবেশাধিকার; এটা হলো শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস; এটা হলো জ্ঞানে ও স্কুলে বর্ধিত হারে প্রবেশাধিকার এবং নির্দিষ্টভাবে বলা যায় সাক্ষরতা অর্জন (*Ray, D.1999, Development Economics, pp. 8-9*) লক্ষণীয় যে, রায় এক্ষেত্রে বহুমুখী বিষয়কে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ উন্নয়ন শুধু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি/প্রবৃদ্ধি অথবা শিল্পায়ন, ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকছে না। "উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি দেশের মানুষ তাঁদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন (যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) মেটানোর সাথে সাথে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মানও বাড়াতে পারেন। ব্যক্তি জীবনের এই পরিবর্তনের পাশাপাশি দেশের অবকাঠামোরও (যেমন- রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) উন্নয়ন ঘটে" (*ইসলাম, রি. ২০১০, উন্নয়নের অর্থনীতি, ইউপিএল, পৃ. ১-২*)। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, "উন্নয়নকে দেখা যেতে পারে ... একটা প্রক্রিয়া হিসেবে যা মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে" (*Sen, A, 1999, Development as Freedom, p. 2*) অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মানুষের কল্যাণ। মানুষের কল্যাণকে বাস্তবায়ন করার উপায় বা পদ্ধতি (Means) হচ্ছে স্বাধীনতা, নানা ধরনের স্বাধীনতার কথা অমর্ত্য সেন বলেছেন যার একটির সাথে অন্যটির প্রায়োগিক (Empirical) সংযোগ রয়েছে। তাঁর মতে, ''রাজনৈতিক স্বাধীনতাগুলো (মুক্ত বক্তব্য প্রদান ও নির্বাচন) অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করে। সামাজিক সুযোগসমূহ (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার অবয়বে) অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সহজতর করে তোলে। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ (ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদনের অবয়বে অংশগ্রহণের সুযোগগুলোর কারণে) সামাজিক সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত প্রাচুর্য এবং জনগণের সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করতে পারে"। (*প্রাগুক্ত, পৃ. ১১*)

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নের ধারণা নিয়ে আজো বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অমর্ত্য সেনের মতে, "The concept of development is by no means unproblematic" (*Sen A, 1998, The concept of development, in Handbook of development economics, volume-1, p. 23*) তবে তিনি এটাও মনে করছেন যে, উন্নয়নের ধারণা নিয়ে বিতর্কের কারণে ধারণাগত অনেকগুলো সমস্যা ইতোমধ্যে অধিকতর পরিস্কার হয়েছে। এর মাঝেই উন্নয়ন অর্থনীতির কাজ চালিয়ে যেতে হবে বা এগিয়ে নিতে হবে। কারণ, "Work on development economics need not await a complete solution of the concept of development"(*প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৩)

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিকগণ শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার চেস্টা করেছেন এবং তাঁরা শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছেন। রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম পেটি ''ব্যক্তির মাথাপিছু আয়ের সাথে সম্পর্কিত বাৎসরিক ব্যয়কে পুঁজিতে রূপান্তরিতকরণের মাধ্যমে তার 'মূল্য' নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি পারিশ্রমিক/পারিতোষিক-এর ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশার উৎপাদনশীলতা মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। ... এ্যাডাম স্মীথ, জন স্টুয়ার্ড মিল এবং আলফ্রেড মার্শাল অর্থনীতিতে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। স্মীথের মতে, কোন ব্যক্তি তার

শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তিনি তদপেক্ষা অধিক আয় করেন। মার্শাল শিক্ষার জন্য ব্যয়কে জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কার্ল মার্কস অদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের কাজের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের কাজের মূল্য অধিক হয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন (*L. T. Khoi, The economics of education, in, perspectives in modern economics, p. 1*)।

শিক্ষার অর্থনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পাইওনিয়ার হিসেবে এস. স্ট্রুমিলিন এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের দশ বছরব্যাপী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময়ে ১৯২৪ সালে তিনি বিভিন্ন ধরনের ব্লু-কলার (Blue Collar) এবং হোয়াইট কলার (White Collar) চাকুরীজীবিদের শিক্ষার স্তরভেদে প্রাপ্ত বেতন ও উৎপাদনশীলতার তুলনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি চাকুরীজীবিদের বয়স, কাজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতিকে বিবেচনায় নেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, "কারখানায় এক বছর শিক্ষানবিশ শ্রমজীবি হিসেবে কাজ করে যতটুকু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়, একবছর স্কুল শিক্ষা অর্জনকারী তার তুলনায় ২.৬ গুণ বেশি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। উচ্চতর উৎপাদনশীলতা মানে শ্রমিকের উচ্চতর বেতন এবং সমাজ ও দেশের জন্য উচ্চতর জাতীয় আয়" (*Ibid, p. 2*)। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে কতটুকু অর্জিত হয় তা বোঝার জন্য শিক্ষার প্রভাবে অর্জিত জাতীয় আয় থেকে শিক্ষার ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। স্ট্রুমিলিনের হিসেব মতে, "প্রাথমিক শিক্ষায় দশ বছরে ছাত্র সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৮০ লক্ষ করতে ১৬২.২ কোটি রুবল খরচ হবে। কিন্তু এসব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ের উৎপাদনশীলতা বাড়ার ফলে মাত্র পাঁচ বছরে তাদের শ্রমে জাতীয় উৎপাদন বাড়বে ২০০ কোটি রুবলের বেশি" (*মুহম্মদ শামস-উল-হক, ১৯৬৮, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, বাংলা একাডেমী, পৃ.* ১১৭)। এভাবে জাতীয় আয়ে অবদান রাখার মাধ্যমে শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।

সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ কামারভ ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, "এ সময়ে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় আয় ২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৭৭% উৎপাদনশীলতার ৩৮% বেড়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর বৃদ্ধির কারণে এবং শ্রমিক প্রতি ৩৯% উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহের কারণে। উল্লিখিত সময়ে Every rouble spent on education brought in four roubles (*L. T. Khoi, 1992, The Economics of Education, in, Perspectives in Modern Economics, Anmol Publications, p. 29*)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদান সম্পর্কে গবেষণায় যারা অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন থিওডোর শুলজ, এডওয়ার্ড ডেনিসন, গ্যারি বেকার ও অন্যান্য। তবে Theodore Schultz-কে মার্কিন অর্থনীতিতে শিক্ষার অবদান বিশ্লেষণের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদান সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণোত্তর দু'টি মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তিনি তাঁর ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত "The Economic Value of Education" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "প্রথমত: গত তিন দশকে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে তার পেছনে দালান-কোঠা বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রীর চাইতে বিদ্যালয়গত শিক্ষার অবদান বেশি; দ্বিতীয়ত: ১৯০৯ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার যে ভূমিকা ছিল আজ তার ভূমিকা/অবদান সে তুলনায় অনেক বড়" (*মুহম্মদ শাসস-উল-হক, ১৯৬৮, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, পৃ. ৯৫; বাংলা একাডেমী*)। ডেনিসন নানা ঐতিহাসিক তুলনার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৯ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে তার শতকরা ২১ ভাগই হয়েছে শিক্ষার বদৌলতে" (*প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫*)। থিওডোর শুলজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার স্তরভিত্তিক ব্যয় এবং ব্যয়ের উপর অর্জিত লভ্যাংশ সম্পর্কে ১৯৬২ সালে তাঁর "Capital formation by education" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। শুলজের প্রকাশিত প্রবন্ধে ১৯৫৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণোত্তর সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ, "প্রাথমিক স্তরে ব্যয়ের উপর লভ্যাংশ ৩৫%, মাধ্যমিক স্তরে

১০% এবং কলেজ স্তরে ১১%"(প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩)। অন্যদিকে হ্যানসেন তাঁর "Total and Private Rates of Return to Investment in Schooling" নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, "প্রথম দু'বছরের শিক্ষার তুলনায় সাত বা আট বছরের শিক্ষার ফলে লভ্যাংশ শতকরা ৯ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৯ ভাগে। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার ফলে লভ্যাংশ দাঁড়ায় শতকরা ১৪ ভাগ, তার পরের দু'বছরের শিক্ষার দরুণ লভ্যাংশ হয় শতকরা ১৫ ভাগ"(প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩)। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে পরবর্তী সময়ে সম্পাদিত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জার্মানীতে শিক্ষার অবদান ২%, বৃটেনে ১২%, বেলজিয়ামে ১৪%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫% এবং কানাডায় ২৫%। সাখারোপোউলাস ও উডহল দেখিয়েছেন যে, ঘানা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, মালয়েশিয়া ও কোরিয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিক্ষার অবদান হলো ১২% থেকে ২৩% পর্যন্ত" (*Rahman A; 2002, Education for Development, Singapore, p. 12*).

সাখারোপোউলাস ১৯৭৪ সালে ৩৭টি পরিসংখ্যানিক গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "শিক্ষা আয়ের সাথে গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত যা হতে পারে উৎপাদনশীলতার স্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে or by acting as a selection or screening device" (*Ritzen, J. M. M; 1977, Education, Economic Growth and Income Distribution, North Holland Publishing Company, p. 6*)। শিক্ষা ছাড়াও আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী আরো বিভিন্ন চলক (variable) রয়েছে। যেমন- মানুষের অন্তর্নিহিত সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, বয়স, লিঙ্গ, বর্ণ, পরিবারিক ঐতিহ্য, পিতামাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র/খাত প্রভৃতি। তারপরও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায়োগিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, "অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষা মানুষের আয় ৫% থেকে ১৫% বৃদ্ধি করে" (*Psacharopoulos, G; 2000, Bangladesh Education Sector Review, vol-1, p. 88*)

উন্নয়নের জন্য শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখের একটি পত্র থেকে জানা যায়। পাঠের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রের একটি অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত উদ্ধৃতির একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো "... এরা জেনেছে অশক্তিকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা– অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে ..."। এটা মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়ার চিঠি থেকে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অন্নের সংস্থান, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সমস্ত শান্তি অর্জন করা সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন। শিক্ষাই অন্ন, স্বাস্থ্য ও সমস্ত শান্তির একমাত্র মাধ্যম না হলেও শিক্ষাই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপকরণ–এসত্য উপলব্ধির কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং শিক্ষার বহুমুখী ধনাত্মক প্রভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

উন্নয়নের উপর শিক্ষার ধনাত্মক প্রভাব সম্পর্কে অর্মত্য সেন তাঁর বিভিন্ন গবেষণায় বিশ্লেষণ করেছেন। Development As Freedom গ্রন্থে মৌলিক শিক্ষা এবং শিক্ষা সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের মন্তব্য "যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করেন অবশ্যই তিনি এর থেকে উপকৃত হন, কিন্তু এর অতিরিক্ত হলো কোন এলাকায় শিক্ষা ও সাক্ষরতার সম্প্রসারণ হলে সেখানে সামাজিক পরিবর্তন সহজতর হবে ... এবং আরো অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে যা থেকে অন্যরাও উপকৃত হবে" (*Sen A. 1999, Development as Freedom, Oxford University Press, pp. 128-129*)। ধারণা করা যায় যে, এখানে অমর্ত্য সেন শিক্ষার নানামুখী প্রভাবের কথা সম্ভবত: বলতে চেয়েছেন। প্রথমত: ব্যক্তির উপকৃত হওয়া (জ্ঞান আহরণ, বিচার বিশ্লেষণ, ক্ষমতা অর্জন, আয় বৃদ্ধিকরণ, তথ্য ধারণকরণ, যোগাযোগ সৃষ্টিতে সক্ষমতা অর্জন প্রভৃতি); দ্বিতীয়ত: সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হবে অর্থাৎ ধনাত্মক পরিবর্তন হবে যা কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা, অন্ধকার প্রভৃতিকে সরিয়ে সমাজকে আলোর পথে এগিয়ে নিবে; তৃতীয়ত: এমন ধরনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে (হতে পারে মানুষের নিয়োজন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীভূত হওয়া, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া, উন্নত মানের কৃষি উৎপাদন করা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া, শিল্পায়ন ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি), চতুর্থত: সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং এর বাইরেরর এলাকার মানুষও শিক্ষা এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ নানাভাবে উপকৃত হবে।

An Uncertain Glory-India and its contradiction নামক গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে জেন ড্রেজ ও অমর্ত্য সেন- উন্নয়নে শিক্ষার অবদান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে, "আমাদের মানসম্পন্ন জীবন যাপনের উপর পড়তে, লিখতে ও হিসেব করতে পারার শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। এতে এমন স্বাধীনতা পাওয়া যায় যার সাহায্যে আমরা পৃথিবীকে বুঝতে পারি ... সাক্ষর না হওয়া মানে কারারুদ্ধ হওয়া, স্কুল শিক্ষা এমন দরজা খুলে দেয় যার মাধ্যমে মানুষ কারারুদ্ধকরণ থেকে পালিয়ে যেতে পারে ... আমাদের অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ এবং নিয়োজন সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে আমাদের অর্জিত শিক্ষা ও রোপিত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। ... সাক্ষর না হওয়া (সাক্ষরহীনতা) মানুষের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে চাপিয়ে রাখে যা সরাসরি তাদের নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। ... মৌলিক শিক্ষা মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে ... (*Dreze J. & Sen A., 2013, An Uncertain Glory-India and its Contradictions, Penguin books, pp. 107-108*)। এছাড়াও শিক্ষা মানবাধিকার সংরক্ষণে, আইনগত অধিকার সংরক্ষণে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীদের ক্ষমতা ও কণ্ঠস্বর (Voice) বৃদ্ধিতে, সমাজের শ্রেণি ও বর্ণ বৈষম্য হ্রাসে ব্যাপকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই "ইউরোপ ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা, যা বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে, যা থেকে শিক্ষার ব্যাপক ভূমিকা বের হয়ে আসে, যা সাধারণভাবে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহজতর করে তোলে ও অব্যাহত রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দী ও পরবর্তীতে এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে" (*Ibib, pp. 110-111*)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলায় শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত কোন ধাতু থেকে এসেছে?
ক. 'শাস্'
খ. 'শিস্'
গ. 'শিক্ষা'
ঘ. 'শার্শ'

২. মার্কিন অর্থনীতিতে শিক্ষার অবদান বিশ্লেষণের পথিকৃত হিসেবে কাকে বিবেচনা করা হয়?
ক. এডওয়ার্ড ডেনিসন
খ. গ্যারিবেকার
গ. থিওডোর শুলজ
ঘ. কামারভ

৩. "Development as Freedom" গ্রন্থের লেখক কে?
ক. ড. আবু আহমুদ
খ. ড. আবুল বারকাত
গ. গুনার মিরডাল
ঘ. অমর্ত্য সেন

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। গ; ৩। ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদান বর্ণনা করুন।
২. 'সাখারোপোউলাস এবং অমর্ত্যসেন-এর গবেষণা থেকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদান ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.২: এশিয়ার উন্নত দেশসমূহের উন্নয়নে শিক্ষার অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাপানের উন্নয়নে শিক্ষার অবদান বিবৃত করতে পারবেন;
- সিঙ্গাপুরের উন্নয়নে শিক্ষার অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদানের স্তরবিন্যাস করতে সক্ষম হবেন;
- উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক আন্তর্জাতিক ভাষা জানার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষায় অর্থায়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- শ্রম নিবিড় শিল্পায়ন, পুঁজি নিবিড় শিল্পায়ন, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, শিক্ষার ব্যক্তিগত প্রতিদান, শিক্ষার সামাজিক প্রতিদান প্রভৃতি ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মূল/প্রধান ভূমিকা থাকার যৌক্তিকতা উত্থাপন করতে পারবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহ থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে এশিয়ার উন্নত দেশসমূহ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

১৮৬৮ সালে মেইজী সংস্কারের মাধ্যমে জাপানে সামন্তবাদের অবসান ঘটে।এরপর জাপানে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ, শহরায়ন, শ্রমবিভাগের সাথে শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। আনুমানিক এক হিসেব মতে দেখা যায় যে, "১৮৬৮ সালে জাপানে পুরুষদের ৪৩% এবং নারীদের ১০% সাক্ষর ছিল। ইংল্যান্ডে ১৮৩৭ সালে প্রতি চার বা পাঁচ জনের মধ্যে মাত্র একজন স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করে। জাপানে ১৮৭৫ সালে ৫৪% পুরুষ ও ১৯% নারী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে" (*Nakamura Takafusa et al, 1985, Economic Development of Modern Japan, Ministry of Foreign Affairs, Japan, p. 29*)।

জ্ঞানার্জন ও সঞ্চয়ন জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা জাপানের সংস্কারের অন্যতম নেতা কিডো তাকায়োসির বক্তব্য থেকে পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। ১৮৭২ সালে The Fundamental Code of Education প্রচার করা হয়। এতে জনগণের নিকট অঙ্গীকার করা হয় যে, কোন সম্প্রদায়েই সাক্ষরবিহীন/ নিরক্ষর পরিবার থাকবে না, কোন পরিবারেও নিরক্ষর লোক থাকবে না। জাপানে সংস্কারের অন্যতম নেতা কিডো তাকায়োসি মৌলিক ধারণাটা এভাবে বর্ণনা করেন যে, "Our people are no different from the Americans or Europeans of today; it is all a matter of education or lack of education" (*Dreze Jean & Sen Amartya, An uncertain glory India and its contradictions, pp. 35-36*) .

"জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে শিক্ষার প্রতি নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে। মেইজী শাসনামলে (১৮৬৮-১৯১২) উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে শিক্ষার জন্য সমগ্র জাপানের বাজেটের ৪৩% ব্যয় করা হয়েছে" (*Dreze & Sen, Ibid, p. 111*)। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। "১৯১০ সালে জাপানের যুবকদের প্রায় সবাই সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিল এবং ১৯১৩ সালে ব্রিটেন বা আমেরিকার তুলনায় দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও জাপান ব্রিটেনের তুলনায় অধিক সংখ্যায় পুস্তক প্রকাশ করেছে

এবং আমেরিকার তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি পুস্তক প্রকাশ করেছে" (*Ibid, p. 111*)। শিক্ষার প্রতি এভাবে ব্যাপক মনোনিবেশের কারণেই জাপানে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এর মূল কারণ নিহিত রয়েছে মেইজী যুগের শিক্ষার অগ্রগতির অবদান। মেইজী আমলে "প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাদের চিন্তায় আধুনিক ধারা প্রবর্তন করে এবং তাদেরকে আধুনিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলে। ... অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শিক্ষা এমন ব্যাপক আকারে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, জনসাধারণ ভোগ সীমিত করে সঞ্চিত অর্থ শিক্ষায় ব্যয় করেন (*মুহাম্মদ শামস-উল-হক, ১৯৬৮, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১০৭*)। যদিও শিক্ষাই জাপানের উন্নয়নের পেছনে একমাত্র কারণ নয় তবুও বলা যেতে পারে শিক্ষার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অবদানই জাপানকে এশিয়ার বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। তাই নাকামুরা তাকাফুসা স্বগর্বে লিখেছেন যে, "পরাজয়ের (মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের) ছাই থেকে জাপান যে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্ব তা অবলোকন করেছে" (*Nakamura Takafusa et al, 1985, Economic Development of Modern Japan, Ministry of Foreign Affairs, Japan, p.86*)।

১৮৯৫ থেকে ১৯৬০ সালের পরিসংখ্যানের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, উল্লেখিত সময়ে "শিক্ষাগত মূলধন ২৩০০% বৃদ্ধি পায়, ... শিক্ষাগত মূলধন বৃদ্ধির ফলে ১৯৩০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয়ের ২৫% বৃদ্ধি ঘটেছে। ... জাপান এসময়ে জাতীয় আয়ের ৫% এর অধিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করে" (*প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪*) [*জাপান ও অন্যান্য দেশের শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানসমূহ পাঠের শেষে সারণি-১ এবং পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের জিডিপি-র সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধির হার সারণি-২ এ দেখুন*]।

বৃটিশ উপনিবেশ সিঙ্গাপুর ১৯৫৯ সালে স্ব-শাসিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক মতামতের ভিন্নতার কারণে ৯ আগস্ট ১৯৬৫ সালে লি কুয়ান ইউ-এর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা অর্জনের সময়ে মূলত: মুৎসুদ্দি ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। উপনিবেশবাদীদের সৃষ্ট মৎসুদ্দি ব্যবসা-বাণিজ্যের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুততম ও কার্যকরভাবে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করা হয়। প্রথম দিকে সিঙ্গাপুর মূলত: আমদানী প্রতিস্থাপন জনিত শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হয়। এতে স্থানীয় ভোক্তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণত অদক্ষ শ্রমশক্তি ও দেশের প্রাপ্ত/বিরাজমান অনাধুনিক (Unsophisticated) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট আকারের শিল্পে বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করা হয়। এ সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তবে ১৯৬০ এর মাঝামাঝি সময়ে আমদানী প্রতিস্থাপন শিল্পায়নের সীমাবদ্ধতা ও সহজাত অসঙ্গতি এবং মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হওয়ায় বাজার ছোট হয়ে যাওয়ায় সিঙ্গাপুরকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের কৌশল গ্রহণ করতে হয়। আমদানী প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন কৌশল থেকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ (১৯৬৮ সাল) ও বাস্তবায়নে সিঙ্গাপুরকে সমস্যায় পড়তে হয়। প্রথমত: সিঙ্গাপুরের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। দ্বিতীয়ত: সিঙ্গাপুরের রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন এবং শিক্ষিত শ্রমশক্তির অভাব ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সাল ও তৎপরবর্তী সময়ে সিঙ্গাপুর সরকার শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভেতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে অনুভব করে। জাতি, রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার সম্ভাবনা শিক্ষার মাঝে রয়েছে বলে সরকারের ভেতর শক্তিশালী মতামত সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি ও দেশের সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত করার জন্য বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদাভেদে বৈষম্য না করে ছয় বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য ছয় বছর ব্যাপী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের নীতি ঘোষণা করা হয়।

এভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর সকল শিশুর সমানাধিকারের নীতি কার্যকর করে। মালয়, ইংরেজি, তামিল ও চীনা ভাষায় পড়ার সুযোগ থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় একটি ভাষা শিক্ষা ১৯৬০ সালে বাধ্যতামূলক করা হয়। ঔপনিবেশিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় যে, "১৯৭৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ৯১% ইংরেজি মাধ্যমে, ৯% চীনা ভাষায় এবং সামান্য সংখ্যক তামিল ও মালয় ভাষায় পড়ালেখা করে" (*GOH et. al., Education in Singapore: Development Since 1965, p. 84*)। ১৯৬৬ সাল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও দু'টি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ইংরেজি ভাষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করার ফলে সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক গতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। প্রথমত: এতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও দেশে সিঙ্গাপুরের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও সরবরাহে এবং পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল, আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত: সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষীদের জন্য সুবিধা হয় এবং সিঙ্গাপুরের ব্যবসায় আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সিঙ্গাপুরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল। সিঙ্গাপুরের জনগণের মাঝেও শিক্ষা নিয়ে বেশ সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফলতার কারণে ১৯৭০ এর দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমতে থাকে। "১৯৬৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল ৩৭৯৮২৮ জন যা ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৫৪৯৩৬ জনে"। (*Ibid, p. 85*) সিঙ্গাপুরের শিক্ষা ব্যয় প্রায় পুরোটাই সরকার বহন করে। "১৯৬০ সালে ৫৭.১০ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার বা জাতীয় ব্যয়ের ২৩.৫% এবং ১৯৬৭ সালে ১৩৫.০৫ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার বা জাতীয় ব্যয়ের ২২.৮% শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়" (*Ibid, p. 86*)।

"১৯৯২ সালের হিসেব মতে দেখা যায় যে, সিঙ্গাপুর জিডিপি-র ৫.৪% শিক্ষা খাতে ব্যয় করে, এসময়ে এশিয়ার দেশসমূহের শিক্ষাখাতে গড় ব্যয় ছিল জিডিপি-র ৩.৮%" (*Education for development, p. 90, Tab A19*)। সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা; শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করা হয়। একইভাবে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাপান, ব্রিটেন, ও ফ্রান্সের সহায়তায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনেক কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। "১৯৭৬ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সোপোযোগী ২০% শিক্ষার্থী কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কারিগরি উচ্চ শিক্ষায় ১৯৬৬ সালে ৩৫০০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও ১৯৮০ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০০০ জনে। কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধির ফলে ১৯৮০ সালে সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ৭৭.৬%-এ" (*GOH et. al., Ibid, pp. 88-89*)

১৯৭৮ থেকে ১৯৯৭ সালের মাঝে সিঙ্গাপুর-এর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য দক্ষতামুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সময়ে সিঙ্গাপুরের শিল্পায়নকে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করা হয়। সিঙ্গাপুর শ্রম নিবিড় (Labour Intensive) শিল্পায়ন থেকে দ্বিতীয় স্তরের পুঁজি নিবিড় (Capital Intensive) শিল্পায়নে প্রবেশ করে। এসময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়। সিঙ্গাপুরের অর্থনীতিতে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর সহায়তায় উচ্চ প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি জোর দেয়া হয়। শিক্ষাকে উন্নয়নের মূল বাহন (Major Vehicle) হিসেবে বিবেচনায় রেখে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক সমর্থন দেয়া হয়। ১৯৭৯ সালে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা (System) প্রবর্তন করা হয়। এ সময় কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা,

দেশীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার তৈরিতে জোর দেয়া হয়। "১৯৭৮ সালে সিঙ্গাপুরে গবেষণা বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল ৮১৮ জন এবং ১৯৯২ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৫৪ জন"। (Ibid, p. 98)

সক্ষমতামুখী শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক (Knowledge Based) অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এতে জ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন (Innovation) ও সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগিয়ে শিল্প ও অর্থনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মনে করা হয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে সিঙ্গাপুরের টিকে থাকার ও উন্নয়নের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাই হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হবে। সক্ষমতামুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে ৬ বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ দশ বছরের সাধারণ শিক্ষা দেয়া হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর ও জুনিয়র স্তরে জাতীয়ভাবে পরীক্ষায় অংশ নেয়। সক্ষমতামুখী শিক্ষার মডেলে বেশ নমনীয়তা ও পছন্দের সুযোগ রয়েছে। এতে বহুমুখী ও অবিরত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের নতুন দক্ষতা, উঁচু মানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, শিক্ষায় অপচয় হ্রাস, উচ্চ শিক্ষায় অধিক সংখ্যায় গমন, শিক্ষক স্বল্পতা হ্রাস, প্রতি শিক্ষকের প্রতি বছর ১০০ ঘণ্টার পেশাগত প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয়। একই সাথে সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রম মূল্যায়ন, শিক্ষণ বিজ্ঞান, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদানকে (Components) সংহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এশিয়ার উন্নত দেশসমূহের মাঝে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদান সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। জাপান প্রথমে মৌলিক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। একইভাবে পরবর্তীতে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং চীনও একই পথ অনুসরণ করেছে। এসব দেশ মূলত: রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতি সঠিকভাবে ব্যবহার করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। "But that process was greatly helped by the achievements of these countries in public education" (*Dreg J; and Sen A. (2013), An uncertain glory India and its contradictions, p. 111*).

মৌলিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক এবং অতঃপর উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং সর্বশেষে সকল ক্ষেত্রে উচ্চতর মান সম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করে। "পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি হয় ৫.৫% হারে" (*World Bank, 1996, The East Asian Miracle, p. 28*)। এই আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের আয় বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাস পেতে থাকে এবং জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু বৃদ্ধি পেতে থাকে। "১৯৬০ সালে জন্মকালে সিঙ্গাপুর-এর মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৬৫ বছর যা ১৯৯০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৪ বছরে। ১৯৬০ সালে হংকং এর মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৬৪ বছর যা ১৯৯০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৮ বছরে" (*Ibid, p. 34*)।

১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সালের হিসেবে জন্ম ও মৃত্যু হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "হংকং, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডে জন্মহার এবং মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে" (*Ibid, p.40, Table 1.7*)। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হারের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সঞ্চয়ের হার ১৯৬৫ সালে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর চেয়ে কম থাকলেও ১৯৯০ সালে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সঞ্চয় হার ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের তুলনায় ২০% বেশি ছিল। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৬৫ সালে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের বিনিয়োগের হার ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের সমপরিমাণ ছিল যা ১৯৯০ সালে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের গড় বিনিয়োগের হারের দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়" (*Ibid, p. 41*)।

পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ শিক্ষা থেকে কি প্রতিদান (Rates of Return) পেয়েছে বা কি ধরনের ফলাফল অর্জন করেছে তা আলোচনা করা যেতে পারে। সচরাচর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিদানকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার অবদান হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়। Psacharopoulos, G. ১৯৭৩ সালে ৩২টি দেশের শিক্ষার প্রতিদান সম্পর্কে প্রাপ্ত মূল্যায়নসমূহ সংগ্রহ করেছেন। তিনি শিক্ষার ব্যক্তিগত প্রতিদান (Private rates of returns) ও সামাজিক প্রতিদান (Social rates of returns) আলাদাভাবে নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার ব্যয় নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয়ের সাথে সরকারি ব্যয় (Public Expenditure) যোগ করে তা সামাজিক ব্যয় হিসেবে ধরা হয়। অপরপক্ষে ব্যক্তিগত ব্যয়ে (Private Expenditure) শুধু শিক্ষার্থীদের পারিবারিক/ব্যক্তিগত ব্যয়কেই ধরা হয়। এ কারণেই সবসময় শিক্ষার সামাজিক প্রতিদান ব্যক্তিগত প্রতিদান অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে, "১৯৬৬ সালে সিঙ্গাপুরের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারীদের সামাজিক প্রতিদান ছিল ৬.৬%, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারীদের সামাজিক প্রতিদান ছিল যথাক্রমে ১৭.৬% ও ১৪.৬%। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রতিদান ছিল যথাক্রমে ২০.০% এবং ২৫.৪%। জাপানের ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সামাজিক প্রতিদান ছিল যথাক্রমে ৫.০% ও ৬.০% এবং ব্যক্তিগত প্রতিদান ছিলো যথাক্রমে ৬.০% ও ৯.০%। ফিলিপাইনের ১৯৬৬ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সামাজিক প্রতিদান ছিল যথাক্রমে ৭.০%, ২১.০% ও ১১.০% এবং ব্যক্তিগত প্রতিদান ছিল যথাক্রমে ৭.৫%, ২৮.০% এবং ১২.৫%" (*World Bank, 1980, Education and Income, Staff Working Paper No. 402, USA, p. 18*)।

উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মেইজী আমলের জাপান স্বাধীনতা পরবর্তী সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ এসত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বলেই প্রতিটি দেশের জনগণ ও সরকার শিক্ষার উন্নয়নে বহুমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন।

পরিসংখ্যানসমূহ থেকে আরো একটি বিষয় দেখা যায় তাহলো– প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিদান অধিক। এতে উল্লেখিত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে অধিকতর সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

১৯৬০ এর দশক থেকে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হয়। থাইল্যান্ড ব্যতীত পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থীরা সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশের তুলনায় অধিক সংখ্যায়/হারে স্কুলে গমন করেছে। ফলে দ্রুততার সাথে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এতেও লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়াও জনমিতিক (Demographic) উত্তরণ, আয়ের সমতামুখী বিতরণ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় অধিকতর সম্পদ বরাদ্দকরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে ধরে রাখার জন্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শিক্ষিত মানব সম্পদের চাহিদা বেড়েছে এবং সরকার ও শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থনীতির চাহিদা মোতাবেক শিক্ষিত ও মেধাবী মানব সম্পদ সরবরাহে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, "১৯৬০ সালে হংকংয়ের প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.০৯% হারে যদিও প্রবৃদ্ধির পূর্বানুমান করা হয়েছিল ২.৬৮%। পূর্বানুমিত ২.৬৮% প্রবৃদ্ধির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে অর্জিত হয়েছে ৮৬%, মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে অর্জিত হয়েছে ২৩% এবং ১৯৬০-৮৫ সালের গড় ভৌত (Physical) বিনিয়োগ থেকে ৪৬%। তবে থাইল্যান্ড তার পূর্বানুমিত প্রবৃদ্ধির ৮৭% প্রাথমিক শিক্ষা থেকে, ১৩% মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে এবং ৩৫% গড় ভৌত বিনিয়োগ থেকে অর্জন করেছে। সিঙ্গাপুর-এর পূর্বানুমিত প্রবৃদ্ধির ৭৫% ও ২২% অর্জন করেছে যথাক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে।

জাপানের পূর্বানুমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬৯% কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৬৯% । পূর্বানুমিত প্রবৃদ্ধির হারের ৫৮% প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৪১% মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে অর্জিত হয়েছে (*World Bank, 1993, The East Asian Miracle, Table 1.9, Oxford University Press, pp. 52-53*) ।

পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের উন্নয়নে জ্ঞানগত দক্ষতাসমূহ বিশেষ অবদান রেখেছে। অর্থনৈতিক বিভিন্ন মাত্রার উন্নয়ন অর্জনকারী দেশসমূহের তের বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের গণিতের পাঁচ ধরনের সমাধানের (স্বীকৃত মান অনুযায়ী) পরীক্ষা নেয়া হয়। "এতে সকল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষার্থীরা প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৮০-৮২ সালে অনুরূপ আরেকটি পরীক্ষায় বীজগণিতের সমস্যা সমাধান করে জাপানের শিক্ষার্থীরা সর্বাপেক্ষা বেশি নম্বর (৬০%) লাভ করে। থাইল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা ৩৯% এবং হংকং-এর শিক্ষার্থীরা ৪১% নম্বর অর্জন করে" (*World Bank, Ibid, p. 71*) । এক্ষেত্রে উল্লেখিত তিনটি ছাড়া আর কোন পূর্ব এশিয়ার দেশের শিক্ষার্থী ছিল না। বোঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞানগত দক্ষতার দিক থেকেও পূর্ব এশিয়ার শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করেছে যা পরবর্তীতে তাদেরকে জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতি বিনির্মাণে সহায়তা করেছে।

সারণি- ১: শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের শতাংশ (%) এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত।

	জিডিপি ব্যায়ের শতাংশ								সরকারি সমগ্র ব্যয়ের শতাংশ (%)			শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (প্রতি শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থী)					
												প্রাথমিক শিক্ষা			মাধ্যমিক শিক্ষা		
বছর / দেশের নাম	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯২	২০০০	২০০৫	সর্বশেষ	২০০০	২০০৫	সর্বশেষ	২০০০	২০০৫	সর্বশেষ	২০০০	২০০৫	সর্বশেষ
জাপান	৪.০	৪.১	৩.৯	৫.৮	৪.৯	৩.৬	৩.৫	৩.৮ (২০১০)	১০.৫	৯.৫	৯.৪ (২০০৮)	২০.৭	১৮.৯	১৭.৮ (২০১০)	১৪.০	১২.৬	১১.৯ (২০১০)
কোরিয়া প্রজাতন্ত্র	-	৩.১	৩.৫	৩.৭	৪.৪	-	৪.১	৫.০ (২০০৯)	-	১৫.৩	১৫.৮ (২০০৮)	৩২.১	২৭.৯	২০.৯ (২০১০)	২১.০	১৮.১	১৭.৬ (২০১০)
সিঙ্গাপুর	-	৪.২	৩.১	২.৮	৫.৪	৩.৪	-	৩.৩ (২০১২)	-	-	২২.৭ (২০১২)	-	-	১৭.৪ (২০০৯)	-	-	১৪.৯ (২০০৯)
হংকং	১.৫	২.১	২.৬	২.৫	৩.১	-	৪.১	৩.৪ (২০১১)	-	২২.৫	২০.১ (২০১১)	২১.৫	১৮.৩	১৪.৮ (২০১১)	-	-	-
ইন্দোনেশিয়া	১.২	১.৬	২.৮	১.৭	২.২	-	২.৯	২.৮ (২০১১)	-	১৪.৯	১৫.২ (২০১১)	২২.৪	২০.৪	১৫.৯ (২০১১)	১৫.৮	১২.৫	১৪.৮ (২০১১)
মালয়েশিয়া	-	৩.৯	৪.৪	৬.০	৫.৫	৬.০	-	৫.১ (২০১০)	২৬.৭	-	২১.৩ (২০১০)	১৯.৬	১৬.৯	১২.৭ (২০১০)	১৮.৪	১৬.৩	১৩.৭ (২০১০)
ফিলিপাইন	২.৪	২.৬	২.৬	১.৭	৩.০	৩.৩	২.৪	২.৭ (২০০৯)	১৩.৯	১৫.২	১৫.০ (২০০৯)	৩৫.৩	৩৫.১	৩১.৪ (২০০৯)	-	৩৭.৯	৩৪.৮ (২০০৯)
থাইল্যান্ড	০.৬	২.৬	৩.৫	৩.৪	৩.৬	৫.৪	৪.২	৫.৮ (২০১১)	৩১.০	২৪.০	২৯.৫ (২০১১)	২০.৮	-	১৬.০ (২০০৮)	-	-	১৯.৯ (২০১১)
বাংলাদেশ	-	-	-	১.৫	২.৩	২.৪	-	২.২ (২০০৯)	১৫.০	-	১৪.১ (২০০৯)	৪১.১	৩১.১	২৫.৪ (২০১১)	৩২.৫	২৮.১	২০.৫ (২০১১)
ভারত	০.৮	২.৩	২.৮	৩.০	৩.৯	৪.৩	৩.১	৩.৩ (২০১০)	১২.৭	-	১০.৫ (২০১০)	৪০.০	-	-	৩৩.৬	-	২৫.৩ (২০১০)
শ্রীলংকা	৩.০	৪.৭	৪.০	২.৭	৩.৩	-	-	২.০ (২০১১)	-	-	১২.৯ (২০১১)	-	২১.৯	২৪.১ (২০১১)	-	-	১৭.৩ (২০১১)

উৎস: 1. Mingat (1995), p. 33; quoted in Rahman A. (2002), Education for Development, p. 90, Table A19 (based on UNESCO Yearbooks); Statiscal Yearbook for Asia and the Pacific 2013; p. 100

সারণি-২: পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%), ১৯৮১-২০১৫

তারিখ	দক্ষিণ কোরিয়া	জাপান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	থাইল্যান্ড
২০১৫	২.৬১	০.৫৪	৪.৯৭	২.০১	২.৮৩
২০১১	৩.৬৮	-০.৪৫	৫.২৯	৬.২১	০.৮৩
২০১০	৬.৫০	৪.৭১	৭.৪২	১৫.২৪	৭.৫১
২০০৯	০.৭১	-৫.৫৩	-১.৫১	-০.৬০	-০.৭৪
২০০৬	৫.১৮	১.৬৯	৫.৫৮	৮.৮৬	৪.৯৭
২০০১	৪.৫৩	০.৩৬	০.৫২	-০.৯৫	৩.৪৪
১৯৯৮	-৫.৪৭	-২.০০	-৭.৩৬	-২.২৩	-৭.৬৩
১৯৯৭	৫.৯২	১.৬০	৭.৩২	৮.২৯	-২.৭৫
১৯৯৬	৭.৫৯	২.৬১	১০.০০	৭.৫৩	৫.৬৫
১৯৯১	১০.৩৫	৩.৩৫	৯.৫৫	৬.৬৯	৮.৪০
১৯৮৭	১২.৪৭	৩.৭৯	৫.১৯	১০.৭৬	৯.৫২
১৯৮৬	১১.২২	২.৯৬	১.২৪	১.৩৩	৫.৫৩
১৯৮১	৭.১৮	২.৯৩	৭.১১	১০.৬৮	৫.৯১

উৎস: Available from www.ARIC.ADB.ORG, Date: 29.01.2017

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. ১৮৬৮ সালে কোন সংস্কারের মাধ্যমে জাপানে সামন্তবাদের অবসান ঘটে?
   ক. মেইজী
   খ. শেইজী
   গ. কেইজী
   ঘ. নেইজী

২. ১৯৬৩ সালে সিঙ্গাপুর কোন্ দেশের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়?
   ক. থাইল্যান্ড
   খ. মালয়েশিয়া
   গ. চীন
   ঘ. জাপান

৩. কোন দশক থেকে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হয়?
   ক. ১৯৫০
   খ. ১৯৭০
   গ. ১৯৬০
   ঘ. ১৯৮০

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। খ; ৩। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শ্রম নিবিড় এবং পুঁজি নিবিড় শিল্পায়ন বলতে কী বোঝায়?
২. শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবদানের পার্থক্য কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার অবদান ব্যাখ্যা করুন।
২. সিঙ্গাপুর-এর জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৬.৩: শিক্ষা এবং দারিদ্র্য উপশম/লাঘব করা/বিমোচন করা
Education and Poverty Alleviation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দারিদ্র্যের ধারণা, ব্যাপ্তি ও গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা নিরূপণ করতে পারবেন;
- নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্য রেখার পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার উপযোগিতা/গুরুত্ব শনাক্ত করতে পারবেন।

আসমানী

জসীমউদ্দীন

আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও,
রহিমদ্দীর ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা-ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,
তারির তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে।

পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দেছে অনাহারে ক'দিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হতে হাসির প্রদীপ-রাশি
থাপড়েতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।
পরণে তার শতেক তালির শতেক ছেঁড়া বাস,
সোনালী তার গার বরণের করছে উপহাস।
ভোমর কালো চোখ দুটিতে নাই কৌতুক হাসি,
সেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু রাশি রাশি।
বাঁশীর মত সুরটি গলায় ক্ষয় হল তাই কেঁদে,
হয়নি সুযোগ লয় যে সে সুর গানের সুরে বেঁধে।

আসমানীদের বাড়ির ধারে পদ্ম-পুকুর ভরে
ব্যাঙের ছানা শ্যাওলা-পানা কিল-বিল-বিল করে।
ম্যালেরিয়ার মশক সেথা বিষ গুলিছে জলে,
সেই জলেতে রান্না-খাওয়া আসমানীদের চলে।
পেটটি তাহার দুলছে পিলেয়, নিতুই যে জ্বর তার,
বৈদ্য ডেকে ওষুধ করে পয়সা নাহি আর।

দারিদ্র্য: ধারণা, ব্যাপ্তি ও গতি-প্রকৃতি

"আমাকে জিজ্ঞেস করোনা দারিদ্র্য কি–কারণ তুমি আমার ঘরের বাইরে এটাকে দেখেছো। আমার ঘরটির দিকে তাকাও এবং ছিদ্রগুলোর সংখ্যা গণনা করো। আমার যা কিছু আছে সবগুলো ভালো করে দেখ এবং যা দেখতে পাচ্ছো তা লেখ। তুমি যা দেখতে পাচ্ছো তা হলো দারিদ্র্য"কেনিয়ার জনৈক ব্যক্তি (*The World Bank, 2000, The World Bank Development Report 2000/2001, Washington DC, USA, p. 16*)। অমর্ত্য সেন দারিদ্র্যকে আখ্যায়িত করেছেন "একটি বঞ্চনার কাহিনী" হিসেবে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকাশিত বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট (২০০০–২০০১) দারিদ্র্যকে মানুষের ভাল থাকা থেকে বঞ্চিতকরণ অর্থাৎ বস্তুগত বঞ্চিতকরণ (যা মানুষের আয় বা ভোগের ব্যয় পরিমাপের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়), শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাক্‌শক্তি, ক্ষমতা, নিরাপত্তা, বিচার থেকে বঞ্চিতকরণকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও মানুষকে আক্রম্যতায়/অরক্ষিত অবস্থায় রাখা (Vulnerability) অর্থাৎ হিংস্র আচরণ, অপরাধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, বিদ্যালয় থেকে বের হতে বাধ্য হওয়া প্রভৃতিও বঞ্চিতকরণের পর্যায়েই পড়ে। এভাবে নানাবিধ/বহুমুখী বঞ্চিতকরণ মানুষের অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা বা সক্ষমতাকে অবদমিত করে। অমর্ত্য সেনের মতে, "Capabilities that a person has, that is, the substantive freedoms he or she enjoys to lead the kind of life he or she has the reason to value". (*Sen A, 1999, Development as freedom, Oxford University Press, 2000, p. 87*).

অনেকেই মূলত: স্বল্প আয়কেই দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা ঘোষণায় এবং ১৯৯৯ সালের ৫৩তম প্রস্তাবে উন্নয়নের অধিকার বলতে মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, বাসস্থান, শাসন, গণতন্ত্র, শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন, আশ্রয়, শোষণ ও বৈষম্য থেকে রক্ষা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের ঘোষণায় মানুষের বস্তুগত, জ্ঞানগত ও পরিবেশগত অধিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এসকল অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ নানামুখী বঞ্চিতকরণ বা দারিদ্র্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দারিদ্র্য একটি জটিল ও বহুমাত্রিক ধারণা। একমাত্রিক দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় একটি বিশেষ মাপকাঠি ও স্তরকে ব্যবহার করা হয়–তা হতে পারে আয় দারিদ্র্য অথবা শিক্ষা দারিদ্র্য অথবা স্বাস্থ্য দারিদ্র্য প্রভৃতি। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নানাভাবে ও বিভিন্ন উৎস থেকে বিকাশ লাভ করে। আয়, বঞ্চনা, ভোগ-ঘাটতি, পুষ্টিহীনতা, শিক্ষার অভাব, অস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সেবার সুযোগহীনতা, অনিয়োজনের আর্থিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি, লৈঙ্গিক অসমতা প্রভৃতি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশ করে। আবার কোন ব্যক্তি উপর্যুক্ত সকল বঞ্চনা, সংকট মোকাবেলায় অক্ষমতা, ক্ষমতাহীনতা ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্ত হয়েও যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাহলে তিনি মুহূর্তে পরিণত হবেন দুর্বল দরিদ্র জনে। এভাবেই "ক্ষমতাহীনতা ও প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কথা বলতে না পারা ... সংকুচিত সুযোগ, পাঁচিলঘেরা নীতি ও প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও ক্ষমতার অসম বণ্টন এবং বৈরী সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে দরিদ্র সম্প্রদায়। এ যেন এক নিরন্তর প্রক্রিয়া" (*আতিউর রহমান, আরিফুর রহমান, ২০০২, দারিদ্র্য বিমোচন: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঊনবিংশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৮, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, পৃ.* ২)। এই নিরন্তর প্রক্রিয়ার বা সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতার প্রতিবাদে "ওয়াল স্ট্রিট দখল করো" (Occupy wall street) আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের শ্লোগান ছিলো "We are the 99 percent''। এ আন্দোলনের কয়েক বছর আগে ক্রমবর্ধমান এ অসমতা বৈষম্য উপলব্ধি করে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Joseph stiglitz একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম "of the 1% for the 1%, by the 1%" (*বারকাত, আবুল; ২০১৪, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, লোকবক্তৃতা ২০১৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, পৃ.* ৬৬)।

বাংলাদেশের ২০১০ সালের গৃহস্থালির আয় ও ব্যয় জরিপের তথ্যে মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক দ্রব্যাদির হিসেব মতে দেখা যায় যে, "নিম্ন দারিদ্র্য রেখায় মাথা গণনার হার অনুযায়ী ১৭.৬% মানুষ বা সমগ্র জনসংখ্যা ১৪৮.৪৯ মিলিয়নের মধ্যে ২৬.১৬ মিলিয়ন দরিদ্র। তবে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ৩১.৫% বা সমগ্র জনসংখ্যার ৪৬.৭৭ মিলিয়ন দরিদ্র। দেখা যাচ্ছে যে, নিম্নবিত্তের ৫% মানুষের আয় ০.৭৮% এবং উচ্চবিত্তের ৫% মানুষের আয় হলো ২৪.৬১%" (*BBS, 2011, Report of the Household income and expenditure survey 2010; xix, xxi, 30*).

তবে উন্নত দেশের দারিদ্র্যের ধারণার সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যের ধারণার যথেষ্ট অমিল রয়েছে, যদিও দু'ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যকে বঞ্চনা হিসেবেই মনে করা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, দারিদ্র্যের ধারণা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক উন্নয়ন অর্থনীতিতে বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমত, সীমিত সামর্থ্যের কারণে মানুষের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে ব্যর্থতাকেই দারিদ্র্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। "এই সীমিত সামর্থ্যের বহি:প্রকাশ হিসেবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যেসব দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন, তা ক্রয় করার ক্ষমতার অভাবকে" *(মোস্তফা কামাল মুজেরী, ১৯৯৭, দারিদ্র্যের পরিমাপ পদ্ধতি ও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রবণতা, রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত), 'দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', ঢাকা (বিআইডিএস), পৃ. ৬৮)*। দ্বিতীয়ত, মৌলিক চাহিদার কার্যকর ধারণা বহুমাত্রিক এবং একে শুধুমাত্র আয় অথবা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বঞ্চনার বিভিন্ন দিক এতে অন্তর্ভুক্ত করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। এছাড়া জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের একটি অংশ স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং অপর অংশ যা মৌলিক চাহিদা (যেমন- খাদ্য) হিসেবে পরিচিত তা অনেকটা অপরিবর্তনশীল।

শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন/দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষা

শিক্ষাই শক্তি যা মানুষকে মুক্তি দানে সহায়ক। এ বক্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের লেখার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জাতীয় বিদ্যালয়" নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে" (*রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা, সংগ্রহ ও সম্পাদনা–শোয়াইব জিবরান, ২০১২, প্রকাশক-সংবেদ, পৃ.* ৩৭)। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি শব্দটির মাধ্যমে বহুমুখী মুক্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৯৩০ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইজভেস্তিয়া (Isvestia) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের বক্তব্য হলো, "In my view the imposing tower of misery which today rests on the heart of India has its sole foundation in the absence of education". (*Dreze, J, Sen A; 2013, An Uncertain Glory India and its Contradictions, Penguin Books, p. 107*).

ড্রেজ ও সেন এটাকে চরম (Extreme) বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, তৎকালীন ভারতের অনেক সমস্যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি সমস্যাকেই আলাদাভাবে বিবেচনা করেছেন। আবার ড্রেজ ও সেন, এটিকে অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন বক্তব্য হিসেবেও বিবেচনা করেছেন। অতঃপর ড্রেজ ও সেনের বক্তব্য হলো, "School education ... are first and formost allies of the poor, rather than only of the rich and the affluent, is an understanding that has informed the Japanese strategy of economic development throughout its entire modern history". (Ibid, p. 111).

শিক্ষা এমনই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখে। ভারতের ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমএম আনসারী দেখিয়েছেন যে, "দারিদ্র্য ও সাক্ষরহীনতা (Illiteracy) সাধারণত একই দিকে ধাবিত হয় এবং একটি অপরটিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে" (*Ansari M. M, 1992, Educational Expenditure and Economic Growth, in, Perspectives in Modern Economics, vol. 15, edited by C. S. Nagpal and A. C. Mittal, Anmol Publications, New Delhi, pp. 77-78*)।

কাজেই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাই বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, "যারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের মাঝে দারিদ্র্যের হার ৬৪%, তবে যারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৪৫%, যারা উচ্চ শিক্ষা (স্নাতক ও তদুর্ধ্ব) গ্রহণ করেছেন তাঁদের মাঝে দারিদ্র্যের হার ১০%। যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেছেন, দারিদ্র্যের উপর তাদের শিক্ষার প্রভাবও (Impact) প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যারা মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছে তাদের মাঝে দারিদ্র্যের হার শুধু ২০% অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারীদের তুলনায় ২৫% কম। এমনকি প্রাথমিক স্তরের পর যারা শিক্ষা অর্জন বন্ধ করেনি কিন্তু এসএসসি পাশ করেনি তাদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারীদের তুলনায় দারিদ্র্য ১০% কম" (*BIDS, 2001, Fighting Human Poverty- Bangladesh Human Development Report 2000, p. 35*)।

বিআইডিএস-এর গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা গ্রহণকারীদের মাঝে দারিদ্র্যের প্রবণতা হ্রাস পায়। তবে এর মাঝে কিছু ব্যতিক্রমও অনেক সময় পরিলক্ষিত হতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই কিন্তু তিনি অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন (পারিবারিকভাবে বা অন্য কোন উপায়ে) সেক্ষেত্রে তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভকারীর তুলনায় উৎপাদন খাতে, মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে অধিক অবদান রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন না হলেও শিক্ষিত মানুষের কাতারেই পড়বেন।

পিতামাতার শিক্ষা সন্তানের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে থাকে। অভিভাবকদের দারিদ্র্যতা, স্বল্প শিক্ষা, স্বল্প আয় প্রভৃতি কারণে তারা সন্তানদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে পারেন না। তাই এসব দরিদ্র পিতামাতার সন্তান অনেক সময় মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারেন না। ফলে তাদের আয়-উপার্জন কম হয় এবং তারা দরিদ্রই থেকে যান প্রজন্ম পরম্পরায়। "দারিদ্র্য ও অশিক্ষার এই মেলবন্ধন না ভাংতে পারলে আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দরিদ্র এবং অশিক্ষিতই থেকে যাব" (*আকাশ এমএম, ২০১৫, দারিদ্র্য দূর করার জন্য শিক্ষাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ, সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৯*)। শিক্ষার সাথে দারিদ্র্যতার যোগসূত্রতা বোঝার জন্য সারণি-৩ এর পরিসংখ্যানসমূহ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সারণি-৩: শিক্ষার স্তরভেদে দারিদ্র্যের প্রবণতা (মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক দ্রব্যাদির ব্যয়ের হিসাব), ২০০৫-২০১০

গৃহস্থালির বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুযায়ী	২০১০			২০০৫		
	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে
১. নিম্ন দারিদ্র্য রেখা						
জাতীয়	১৭.৬	২১.১	৭.৭	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
সাক্ষরতা						
সাক্ষর নয়	২৫.১	২৭.২	১৫.৬	৩৬.৩	৩৭.৫	২৯.৯
সাক্ষর	৯.২	১২.৪	৩.৩	১২.৩	১৫.৩	৬.৭
শিক্ষাস্তর						
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	২৫.১	২৭.১	১৫.৬	৩৬.৩	৩৭.৪	৩০.৩
প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি সমাপ্ত	১৫.৮	১৮.৪	৭.৯	১৯.৩	২১.৮	১২.৬
পঞ্চম-নবম শ্রেণি সমাপ্ত	১১.৪	১৩.৮	৫.৪	১৫.৮	১৭.৫	১১.১
এসএসসি ও তদুর্ধ্ব সমাপ্ত	৩.৪	৬.১	০.৮	৪.৪	৭.১	১.৯
২. উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী						
জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
সাক্ষরতা						
সাক্ষর নয়	৪২.৮	৪৩.৫	৩৯.৪	৫৪.৭	৫৫.১	৫২.৩
সাক্ষর	১৯.০	২৩.৩	১১.৪	২৩.০	২৭.০	১৫.৭
শিক্ষাস্তর						

গৃহস্থালির বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুযায়ী	২০১০			২০০৫		
	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে	জাতীয়	গ্রামীণ	শহুরে
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	৪২.৮	৪৩.৫	৩৯.৪	৫৪.৭	৫৫.০	৫২.৮
প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি সমাপ্ত	৩৫.৭	৩৮.১	২৮.৩	৩৭.৫	৩৯.২	৩৩.০
পঞ্চম-নবম শ্রেণি সমাপ্ত	২২.৬	২৪.৯	১৬.৭	২৯.০	৩০.৯	২৩.৮
এসএসসি ও তদুর্ধ্ব সমাপ্ত	৭.৫	১১.২	৩.৯	৯.৩	১২.২	৬.৫

Source: BBS (2011), Report of the Household Income and Expenditure Survey 2010, p. 69

সারণি থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য শতকরা হিসেবে কমেছে। যারা সাক্ষর করতে পারে না তাঁদের তুলনায় যারা সাক্ষর করতে পারে তাদের মাঝে দারিদ্র্যের প্রবণতা কম। অন্যদিকে দেখা যায়, ২০১০ সালে যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই- তাদের মাঝে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২.৮%, প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্তকারীদের দারিদ্র্যতার হার ছিল ৩৫.৭%, পঞ্চম-নবম শ্রেণি সমাপ্তকারীদের মাঝে দারিদ্র্যতার হার ২২.৬% এবং এসএসসি ও তদুর্ধ্ব শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের মাঝে দারিদ্র্যতার হার ছিল ৭.৫%। সামগ্রিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে দারিদ্র্যতার হার হ্রাস পায়। দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষা একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষিত জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করারও প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে এক ধরনের শিক্ষিত সর্বহারা জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হতে পারে।

শিক্ষা যে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে নিম্নের ছক-১ থেকে তা অনুধাবন করা যায়।

ছক- ১: শিক্ষা, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য

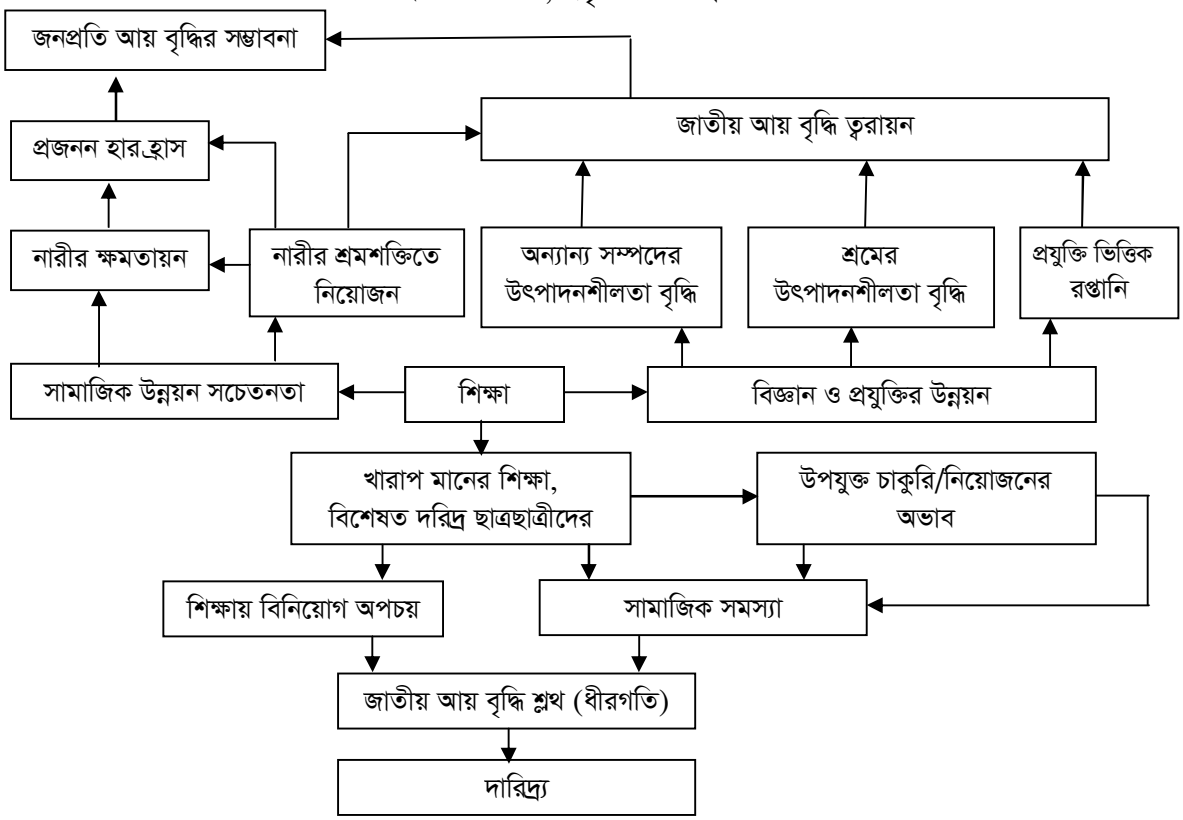

উৎস: সামান্য পরিবর্তনসহ রহমান রুশিদান ইসলাম (২০১২); বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর ৪০ বছর, সাহিত্য প্রকাশ, পৃ. ১৯৪ (চিত্র ৯.১)

মানসম্পন্ন, যুগোপযোগী, প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরি ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাই দারিদ্র্য বিমোচনে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগে জিডিপি-র অংশ বৃদ্ধির। তাহলেই দ্রুততরভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষায় বিনিয়োগ সম্পর্কে Thomas I. Ribich-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হলো, "Underinvestment in eduation is a problem closely associated with poverty: it is the children of the poor who most often leave school early, and it is the earliest school leavers who have the highest odds for earning poverty level incomes" (Ribich T.I. 1968, Education and Poverty, Washington D.C., The Brookings INstitution, p. 13).

ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষা গ্রহণ থেকে যারা বঞ্চিত থাকছেন তাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। এছাড়া সারণি-৩ এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বা উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারী সকল ব্যক্তি বা পরিবার দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। উচ্চ শিক্ষা অধিকতর আয় অর্জনকারী চাকুরি অর্জনের সুযোগ করে দেয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে অথবা পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে উচ্চশিক্ষিত পরিবার প্রধানদের সকল পরিবারও দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। তাই বলা যেতে পারে যে, দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষা অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলেও নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষিত এমনকি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পরিবার দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য কতগুলো উৎস থেকে বিকাশ লাভ করে?
   ক. একটি
   খ. দুটি
   গ. তিনটি
   ঘ. বিভিন্ন

২. উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ২০১০ বাংলাদেশে শতকরা কতজন দরিদ্র ছিল?
   ক. ১৭.৬
   খ. ১৮.৬
   গ. ৩০.৫
   ঘ. ৩১.৫

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দারিদ্র্য কী?
২. নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ও উচ্চ দারিদ্র্য রেখা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষাস্তরের সাথে দারিদ্র্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের ছকটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৪: শিক্ষা-নিয়োজন এবং অনিয়োজন
Education-Employment and Unemployment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নিয়োজন এবং অনিয়োজন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার দেয়া ধারণা বর্ণনা করতে এবং এর দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এবং এর অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পে নিয়োজনের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবেন;
- শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রমশক্তির পরিসংখ্যানসমূহ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন;
- শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের পরিণতিতে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় – ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থনীতির খাতওয়ারী শিক্ষিত শ্রমশক্তির নিয়োজন প্রবণতা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাস্তর অনুযায়ী অনিয়োজনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে এবং অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত শ্রমশক্তি সরবরাহের প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (ILO) মানদণ্ড অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ে (Reference Period) বেতন, মজুরি, লাভ, পারিবারিক প্রাপ্তি/অর্জন (নগদ অর্থ অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে) প্রভৃতির জন্য কোন কর্ম, ব্যবসায়, শিল্পোদ্যোগে কিছু কাজ (অন্তত: এক ঘণ্টা) সম্পাদন করে অথবা চাকরি, ব্যবসায়, শিল্পোদ্যোগ, খামার ইত্যাদিতে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট কারণে অনুপস্থিত রয়েছে কিন্তু উক্ত সংগঠনে তার আনুষ্ঠানিক সংযুক্তি রয়েছে–তাকে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে ঐ ব্যক্তির নিয়োজন (Employment) বলে। আবার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তি কাজ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং কাজ খুঁজছে কিন্তু তার কোন কাজ নেই এরূপ অবস্থাকে অনিয়োজন (Unemployment) হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিয়োজনের মানদণ্ডে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে বা মাসে এক ঘণ্টা কাজ করলেও তাকে নিয়োজিত হিসেবে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত: নিয়োজনের মানদন্ড নির্ধারণে এটা সর্বাপেক্ষা দুর্বল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই দুর্বল মানদণ্ডের কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনিয়োজিত/বেকার শ্রমশক্তির সংখ্যা ব্যাপক হলেও পরিসংখ্যানিকভাবে স্বল্প সংখ্যায় বা শতাংশে সরকারি প্রকাশনায় দেখা যায়।

প্রশ্ন হলো শিক্ষার সাথে নিয়োজন ও অনিয়োজনের সম্পর্ক কতটুকু? একজন অর্থনীতিবিদের মতে "Education does not itself create jobs, except in its own sector of teaching" (*Khoi L. T. 1992, The Economics of Education, in, Perspectives in Modern Economics, Anmol publications, Delhi, p. 31*) কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকে এ সম্পর্কে উপর্যুক্ত অর্থনীতিবিদের নিকট থেকে কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে একত্রে যে পরিমাণ শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অর্ধেক পরিমাণ শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, "২০১৩ সালে বাংলাদেশে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সের ৫৮.১০ মিলিয়ন শ্রমশক্তি সমগ্র অর্থনীতিতে নিয়োজিত ছিল এবং তন্মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল ১.৯ মিলিয়ন বা

সমগ্র নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৩.২৭%" (*BBS, 2015, Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, p. 137*) অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ লক্ষ ৯৬ হাজারের অধিক শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী নিয়োজিত ছিলেন" (*BBS, 2014, Statistical Pocket Book Bangladesh 2014, Ministry of Planning, pp. 308-309*)। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের গণনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মাধ্যমিক স্তরের সকল মাধ্যমের শিক্ষক, উচ্চ শিক্ষা স্তরের সকল শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক শ্রমশক্তির সঠিক নিয়োজনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমশক্তির পশ্চাৎ সংযোগে অবস্থিত শিল্পসমূহে নিয়োজিত শ্রমশক্তিকে বিবেচনায় আনলে Khoi L. T. এর উদ্ধৃতির তাচ্ছিল্য অনেকটাই হালকা হয়ে যাবে। আবার শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংবাদপত্র, বই, বিনোদনমূলক জার্নাল প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিয়োজন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের মাঝে নানাবিধ পণ্য ও নতুন নতুন সেবার চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়োজন বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার সাথে শ্রমবাজার ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। শ্রমবাজারের বিভিন্ন পথে (Avenue) পরিবার/ গৃহস্থালীসমূহ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে/ অর্জনে সচেষ্ট থাকে।

শিক্ষা ও শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ

শিক্ষাব্যবস্থার সাথে শ্রমবাজারে শিক্ষিত শ্রমশক্তির সরবরাহের একটা যোগসূত্র রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হলে শ্রমবাজারে শিক্ষিত শ্রমশক্তির যোগান/সরবরাহ হ্রাস পাবে অর্থাৎ অর্থনীতি দক্ষ শ্রমশক্তির অভাবে পড়বে এবং এতে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। একইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে শ্রমবাজারে শিক্ষা ও দক্ষতাসহ অধিক সংখ্যক শ্রমশক্তি প্রবেশ করে। কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়নের স্তরের সাথে শিক্ষিত শ্রমশক্তির সরবরাহ ও চাহিদাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা না গেলে শিক্ষিত শ্রমশক্তির ঘাটতি দেখা দিবে অথবা বেকারত্ব বা অনিয়োজন সৃষ্টি হবে। শিক্ষিত শ্রমশক্তির এই অনিয়োজনের ফলে এক ধরনের "বুদ্ধিবৃত্তিক সর্বহারার" (Educated Proletariat) সংখ্যাধিক্য দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০-এর (সারণি–৪) তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৪০% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, ২৩% মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে, ২৩% ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেছে। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার অবস্থা নাজুক বলা যায়। ব্যাচেলর ও তদুর্ধ্ব শিক্ষার অবস্থাও ভাল নয় এবং এক্ষেত্রে নারীরা বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

সারণি-৪: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের শ্রমশক্তি ২০১০ সাল

শিক্ষার স্তর	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
মোট	৫৬৬৫১	৩৯৪৭৭	১৭১৭৪	১০০%	১০০%	১০০%
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	২২৭১৯	১৫৭৩৮	৬৯৮১	৪০.১০	৩৯.৮৭	৪০.৬৫
প্রথম–পঞ্চম শ্রেণি	১২৯৪৩	৯০৫০	৩৮৯৩	২২.৮৫	২২.৯২	২২.৬৭
৬ষ্ঠ-দশম শ্রেণি	১৩১৬৪	৮৭২০	৪৪৪৪	২৩.২৪	২২.০৯	২৫.৮৮
এসএসসি,এইচএসসি/সমমান	৫৬১৮	৪১৪৪	১৪৭৪	৯.৯২	১০.৫০	৮.৫৮
ব্যাচেলর/মাস্টার্স/মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ারিং	২১০২	১৭৪০	৩৬২	৩.৭১	৪.৪১	২.১১
কারিগরি, ভোকেশনাল ও অন্যান্য	১০৫	৮৬	১৯	০.১৯	০.২২	০.১১

Source: Compiled and calculated from: BBS (2011), Report on Labour Force Survey 2010, Ministry of Planning, pp. 40-41

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত সময়ে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের "নিয়োজিত শ্রমশক্তির মাঝে ২১.৩% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, ২৮.৭% প্রাথমিক শিক্ষা, ৩০.৬% মাধ্যমিক শিক্ষা, ১২.৮% উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, ৬.১% উচ্চ শিক্ষা এবং ০.৪% অন্যান্য শিক্ষা গ্রহণ করেছে"। (*BBS, 2015, Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, pp. 55-56*) শ্রমশক্তি জরিপ রিপোর্ট ২০১০ ও ২০১৩ এর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন শ্রমশক্তির হার হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী শ্রমশক্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে- যা বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

বাংলাদেশের ১৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের জনসংখ্যা ''১০৬.২৭ মিলিয়ন, তন্মধ্যে ২৯.৭২ মিলিয়ন বা ২৭.৯৭% কখনো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করতে যায়নি। ২৯.৭২ মিলিয়নের ভেতর ২৭.৪% এর শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য নেই, ২৫.০% এর অভিভাবকগণ সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নন, ১৬.১% গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ততার দরুণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেনি, ১৪.৫% মনে করে যে শিক্ষার প্রয়োজন নেই, ১০.৪% পারিবারিক আয় বৃদ্ধির কাজে সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকায়, ৪.৮% স্কুলের দূরত্বের দরুণ ও ১.৮% অন্যান্য কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পরেনি" (*Ibid, p. 37*)।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায় যে, শ্রমশক্তিতে বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা গ্রহণকারীর হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এখনো প্রায় তিন কোটি মানুষ শিক্ষা বঞ্চিত রয়ে গেছে। এই বঞ্চনা হয়তো চলতে থাকবে প্রজন্ম পরম্পরায় যা সৃষ্টি করবে নতুন প্রজন্মের স্বল্প উৎপাদনশীল অথবা বেকার বা অর্ধবেকারদের যা সৃষ্টি করবে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র (ছক-২)। এ চক্র থেকে বের করে আনার জন্য জাতীয়ভাবে নীতি প্রণয়ন, ভর্তি অনিচ্ছুক ও তাদের অভিভাবককে কাউন্সেলিং করাসহ সুচিন্তিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ছক-২: শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের ফলাফল: দারিদ্র্য চক্র

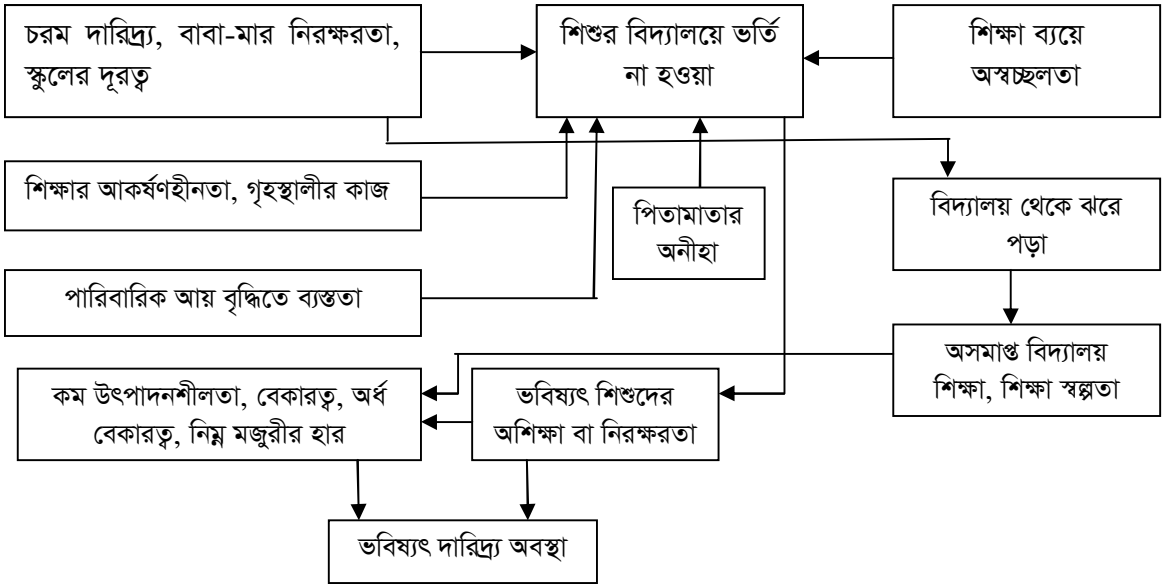

উৎস: সামান্য পরিবর্তনসহ রহমান রুশিদান ইসলাম (২০১২), বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার চল্লিশ বছর, সাহিত্য প্রকাশ, পৃ. ২০১

শিক্ষা ও অর্থনীতির মূল তিনটি সেক্টরে/খাতে নিয়োজন

বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তিনটি সেক্টরে / খাতে বিভাজন করা যেতে পারে। যেমন- কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি শতকরা হারে হ্রাস পাচ্ছে। অবশ্য এখনো পর্যন্ত কৃষিই শ্রমশক্তি নিয়োজনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ খাত হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। নিয়োজনের মাপকাঠিতে সেবা খাত দ্বিতীয় এবং শিল্প খাত তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

সারণি– ৫: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের শ্রমশক্তির (%) শিল্পে নিয়োজন-২০১০

বৃহৎ শিল্প খাত	সমাপ্ত শিক্ষা স্তর						
	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	প্রাথমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	উচ্চ শিক্ষা	অন্যান্য	মোট
কৃষি	৭২.২	৫৭.৩	৩৪.৪	২২.৯	৯.৯	৪৪.৮	৪৫.১
শিল্প	১১.৭	২০.৭	২৮.১	১৯.৭	১৮.৭	১৯.৮	২০.৮
সেবা	১৬.১	২৫.৬	৩৭.৪	৫৭.৫	৭১.৪	৩৫.৪	৩৪.১
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

Source: BBS (2015), Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, p. 57

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন শ্রমশক্তি এখনো কৃষি খাতকে আঁকড়িয়ে রয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমশক্তিই কৃষিতে অধিকহারে নিয়োজিত রয়েছে। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি থেকে দূরে চলে যাওয়ার এবং সেবা ও শিল্প খাতে নিয়োজনের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ কাদা, রৌদ, পানি, অধিক কষ্টকর কৃষিখাতের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রমশক্তি সাদা-কলার (White collar) কর্মকর্তা-কর্মচারী হতেই অধিক আগ্রহী। দেখা যাচ্ছে যে, Blaug-এর "শিক্ষা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অর্থ উপার্জনে শারীরিক ও যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে" *(শেখ ড. মো: দেলওয়ার হোসেন, ২০০৩, শিক্ষা উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি, হাককানি পাবলিশার্স, পৃ. ৬৭)*। মন্তব্যটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে।

উৎপাদনশীল কষ্ট সহিষ্ণু (শারীরিক) কাজ না করার দরুণ শিক্ষিতদের মাঝে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে যাতে শিক্ষিত শ্রমশক্তি কৃষিসহ অন্যান্য কষ্ট সহিষ্ণু খাতে নিয়োজনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বেড়ে যেতে পারে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

এছাড়া গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, "Those with lower levels of educational attainment come from households with lower income and would have more willingness to participate in the labour market" (*Rahman R. I. 2009, Inequality in Access to Education and its Impact on the labour market: A vicious cycle; in, Development experience and emerging challenges Bangladesh, UPL, p. 162*) দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় এবং দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার সুযোগ নেই বলে উদ্যোক্তারা এদের স্বল্প বেতন দিয়ে থাকে।

শ্রমশক্তির পেশাগত নিয়োজন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন শ্রমশক্তি নিয়োজনের ক্ষেত্রে কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতে (৫৩.৯%), প্রাথমিক পেশায় (২৩.৬%), সেবা ও বিক্রয় কর্মী হিসেবে (১০.৪%), দক্ষতা নির্ভর ব্যবসায়ের শ্রমিক হিসেবে (৮.৫%) কাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মাঝে কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতে (৪৪.৫%), দক্ষতা নির্ভর শিল্পের শ্রমিক হিসেবে (২০.৪%), সেবা ও বিক্রয়কর্মী হিসেবে (১৪.০%), প্রাথমিক পেশায় (১২.৫%), কলকব্জা এবং মেশিন অপারেটর ও সংযোজনকারী হিসেবে (৬.৪%) পেশাকে গ্রহণ করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে পেশাগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষাগ্রহণকারীদের কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা হ্রাসমান (৯.৩%), পেশাজীবী

(Professionals) হিসেবে (৩৬.০%), সেবা ও বিক্রয়কর্মী হিসেবে (১৬.২%), দক্ষতা নির্ভর ব্যবসায়ের শ্রমিক হিসেবে (১১.৬%) কাজ করছে" (*BBS, 2015, Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, Table- 6.6, p. 56*)। অর্থাৎ উচ্চতর স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের মাঝে উচ্চ স্তরের পেশা গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে একই ধরনের প্রবণতার উপস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বায়েস ও হোসেন *(দেখুন বায়েস, হোসেন, ২০০৭; গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি: জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা, স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৮৮, ১০২-সারণি ৫.৯*)

শিক্ষা-অনিয়োজন

অনিয়োজনের ধারণা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে এবং অনিয়োজনের ধারণাগত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমশক্তিতে অনিয়োজিতদের শতকরা হারকেই অনিয়োজনের হার বা Unemployment Rate বলা হয়। ২০০৫-২০০৬ সালে বাংলাদেশে অনিয়োজনের হার ছিল ৪.৩%, ২০১০ সালে ৪.৫% এবং ২০১৩ সালে ৪.৩% (*BBS, 2011, Report on Labour Force Survey 2010, Ministry of Planning, p. 75; BBS, 2015, Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, p. 74*) অনিয়োজনের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৫-২০০৬ সালে বাংলাদেশে ২১.০৪ লক্ষ, ২০১১ সালে ২৫.৬৮ লক্ষ এবং ২০১৩ সালে ২৫.৮৭ লক্ষ শ্রমশক্তি অনিয়োজিত অবস্থায় ছিল" (*প্রাগুক্ত, pp. 74,75*) অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে বাংলাদেশে অনিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ এর তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশে ২৫.৮৭ লক্ষ শ্রমশক্তি অনিয়োজিত ছিল এবং তন্মধ্যে ৪.১০ লক্ষ শ্রমশক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে এ ধরনের অনিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা হলো ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার। শিক্ষা প্রাপ্তদের মাঝে দেখা যাচ্ছে (সারণি- ৬) যে, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তরাও অধিক হারে অনিয়োজিত থাকছে। আবার শিক্ষিত পুরুষ শ্রমশক্তির তুলনায় শিক্ষিত নারী শ্রমশক্তি অধিক হারে অনিয়োজনের শিকার হচ্ছে। তৃতীয়ত হলো শহরের শিক্ষিত শ্রমশক্তির তুলনায় গ্রামীণ শিক্ষিত শ্রমশক্তি অধিক হারে অনিয়োজনের কষাঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। শিক্ষিত শ্রমশক্তির অনিয়োজিত থাকার একটা মূলকারণ হতে পারে– শিল্পায়ন বা অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না, তাছাড়া শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধীর গতির দরুণ অর্থনীতির/শিল্পের নিয়োজনের ক্ষেত্রে নতুন খাতের সৃষ্টি হচ্ছে না।

সারণি-৬: বাংলাদেশে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী অনিয়োজনের হার ২০১০-২০১৩

	২০১০ সাল			২০১৩ সাল				
	মোট (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	জাতীয়	গ্রামীণ		শহুরে	
					পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
মোট	৪.৫৩	৪.০৪	৫.৬৬	৪.৩৭	২.৮	৫.৮	৩.৬	১০.৯
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	২.৮২	২.২৭	৪.০৭	৩.২	১.৯	৫.৬	১.৯	১০.৪
প্রাথমিক শিক্ষা	৩.৭৯	৩.৩৯	৪.৭৩	২.৭	১.৮	২.৮	২.৩	৯.১
মাধ্যমিক শিক্ষা	৬.২৪	৬.০০	৬.৭৬	৪.৪	৩.৩	৬.০	৩.৬	৮.৫
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	১৩.৭৪	১১.৮১	১৯.৫৮	৭.৯	৪.৫	১৬.৫	৫.২	১৬.৭
উচ্চ শিক্ষা	৫.০০	৩.৯১	১০.২২	৬.৭	৬.৬	২৩.২	৩.৭	১১.৯
অন্যান্য	০.৯৫	০.০০	৫.২৬	২.৫	১.৮	৪.৩	৩.৫	১.০

Source: Compilled and calculated from: 1. BBS (2011), Report on Labour Force Survey 2010, pp. 40-41, 76-77; 2. BBS (2015), Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, pp. 74-76.

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে উন্নত মর্যাদা ও সম্মানীর কাজ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুত নিয়োজন পেতে চেষ্টা করে। শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্লু-কলার (Blue Collar) শ্রমজীবি না হয়ে হোয়াইট-কলার (White Collar) শ্রমজীবি হওয়ার চিন্তা অধিক মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে। আবার গ্রামীণ পরিবেশে কাজ করা এবং থাকার ক্ষেত্রে এদের মাঝে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। তবে শিক্ষিত শ্রমশক্তির অধিক হারে বেকার থাকার ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী ও স্বল্প শিক্ষিত/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন অভিভাবকদের মাঝে সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সূচকগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। শিক্ষিতদের অনিয়োজনের সমস্যা সত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মের একজন শিক্ষিত অনিয়োজিত অভিভাবক তার ভবিষ্যৎ সন্তানকে অধিকতর শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেটের অভিজ্ঞতার আলোকে জেমস এস মরগ্যান ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে, "Two years of extra education in the first generation seem to result in more than one year of extra schooling in the next generation" (Thomas I. Ribich, 1968, Education a poverty, Washington D.C., The Brookings Institution, p. 102)

সে শিক্ষা যদি কর্মমুখী হয় তাহলে অনিয়োজনের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়ে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৫ এবং তদুর্ধ্ব বয়সের কতজন শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল?
   ক. ১.৯ মিলিয়ন
   খ. ১.৬ মিলিয়ন
   গ. ২.১ মিলিয়ন
   ঘ. ২.২ মিলিয়ন

২. বাংলাদেশে কাদের মাঝে অনিয়োজনের হার বেশি?
   ক. যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই
   খ. প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারীদের
   গ. মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনকারীদের
   ঘ. উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারীদের

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষার সাথে নিয়োজন ও অনিয়োজনের সম্পর্ক কতটুকু?
২. বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কোন কোন তিনটি সেক্টরে বিভাজন করা যেতে পারে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? শিক্ষাক্ষেত্রের বৈষম্যের সাথে দারিদ্র্যের যোগসূত্রতা ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশে উচ্চ স্তরের শিক্ষিতদের মাঝে অনিয়োজনের হার বেশি হওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
৩. বাংলাদেশে অনিয়োজন দূর করার একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করুন।

পাঠ ৬.৫: শিক্ষা-আয় এবং ব্যয়
Education-Income and Expenditure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে আয় বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- শিক্ষাস্তর ভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিদানের তারতম্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরভিত্তিক প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন এবং একই স্তরের শিক্ষা অর্জন সত্ত্বেও আয়ের বৈষম্যের কারণসমূহ (পারিবারিক অবস্থান, সম্পদ/বিত্ত প্রভৃতি) ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পারিবারিক ও সরকারি ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে পারবেন।

শিক্ষা এবং আয়-অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য/বক্তব্য

১৯৭৯ সালে মিনসার (Mincer, J) একটি শিক্ষণ রেখা (Learning curve) এঁকেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, "Earnings are positively correlated with education at any given age (the higher educated earn more) but the earnings rise with age up to a period, and then levels off" (*in Rahman A; 2002, Education for Development-lessons from East Asia for Bangladesh, p. 16*)

১৯৮৪ সালে সাখারোপোউলাস (Psacharopoulos, G.) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, "Individuals with more education tend to enjoy higher incomes, better health, more geographical mobility, and so on" (*in Tan and Mingat, 1992, Education in Asia, The World Bank, p. 45*)

সাখারোপোউলাস ও তিলক (Tilak, Jandhyala B. G.) ১৯৯২ সালে এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, "There is a positive correlation between education and earnings" (*in Rahman A; 2002, Education for Development-lessons from East Asia for Bangladesh, p. 16*)

১৯৯০ সালে সাখরোপোউলাস ল্যাটিন আমেরিকার ১৮টি দেশের শিক্ষা কিভাবে আয়, অসমতা ও দারিদ্র্যের উপর প্রভাব বিস্তার করছে–এ সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, "Clearly education is the variable with the strongest impact on income equality" (*in, Omoniyi M. B. I, 2013, The role of education in poverty alleviation and Economic development: A theoretical perspective and counseling implications, in, British Journal of Arts and Social Sciences, Vol. 15, No. 11 (2013); p. 179*)

১৯৯২ সালে Blaug এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "The positive association between education and earnings is one of the most striking empirical regularities about labour markets in all countries" (*in, World Bank, 2000, Bangladesh Education Sector Review, vol. 1, p. 88*)

তিলক ২০০১ সালের ১৭-১৮ অক্টোবর "Education – A Road out of poverty" নামক সম্মেলনে "শিক্ষা ও দারিদ্র্য" শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। এতে তিনি শিক্ষা ও আয়ের মধ্যকার সম্পর্ক

রেখার সাহায্যে উপস্থাপন করেন। উল্লেখিত গবেষণাপত্রে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "Earnings rising with increase in education levels, almost universally and quite steeply and systematically, in case of general populations as well as sub-groups of populations-males, females, rural, urban, socially backward sections, etc." (*Tilak J. B. G; 2001, Education and Poverty, UNDP, pp. 12-13*)

ছক-৩: মানব পুঁজি গঠন কাঠামোতে শিক্ষা এবং আয়ের সহ-সম্পর্ক

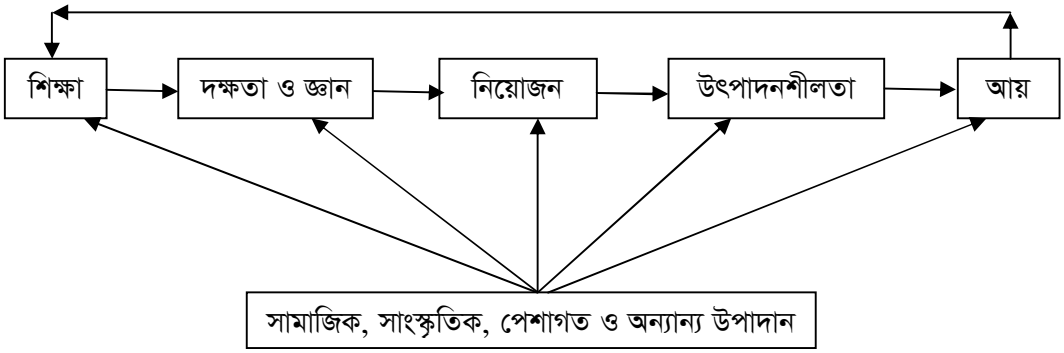

সূত্র: তিলক (২০০১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

শিক্ষার সাথে আয়ের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। ইতোমধ্যে বর্তমান অধ্যায়ের পাঠ- ৬.১ ও পাঠ- ৬.২ এর ভেতর এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত পাঠসমূহে উন্নত ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে শিক্ষার সামাজিক প্রতিদান (Social rates of returns) ও ব্যক্তিগত প্রতিদান (Private rates of return) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত সাখারোপোউলাস-এর সর্বশেষ গবেষণা প্রবন্ধের একটি সারণি নিচে উপস্থাপন করা হলো। এতে ১৯৯৪ সালের পর্যালোচনার পর এ সকল ফলাফলের মূল্যায়নে নতুন ৬টি পর্যবেক্ষণ ও ২৩টি দেশের তথ্যের হালনাগাদকরণ হয়েছে।

সারণি–৭: শিক্ষায় স্তরভেদে বিনিয়োগের প্রতিদান, সম্পূর্ণ পদ্ধতি, সর্বশেষ বছর, আঞ্চলিক গড় (%)

এলাকা	সামাজিক প্রতিদান			ব্যক্তিগত প্রতিদান		
	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চতর	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চতর
এশিয়া	১৬.২	১১.১	১১.০	২০.০	১৫.৮	১৮.২
ইউরোপ/মধ্যপ্রাচ্য/উত্তর আফ্রিকা*	১৫.৬	৯.৭	৯.৯	১৩.৮	১৩.৬	১৮.৮
ল্যাটিন আমেরিকা/ ক্যারিবীয় দেশসমূহ	১৭.৪	১২.৯	১২.৩	২৬.৬	১৭.০	১৯.৫
ওইসিডিভূক্ত দেশসমূহ	৮.৫	৯.৪	৮.৫	১৩.৪	১১.৩	১১.৬
সাব-সাহারান আফ্রিকা	২৫.৪	১৮.৪	১১.৩	৩৭.৬	২৪.৬	২৭.৮
সারা পৃথিবী	১৮.৯	১৩.১	১০.৮	২৬.৬	১৭.০	১৯.০

Source: Psacharopoulas G, Patrinos H. A (2004), Returns to investment in Education: A Further update, in, Education Economics, vol. 12, No. 2, August 2004, p. 114. * Non-OECD

সারণি- ৭ এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা/ক্যারিবীয় দেশসমূহে শিক্ষার সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিদান পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দেশের তুলনায় বেশি। এশিয়ার

দেশসমূহে শিক্ষার প্রতিদান বিশ্ব গড়ের কাছাকাছি রয়েছে। শিক্ষার প্রতিদানের দিক থেকে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে ইউরোপ/মধ্যপ্রাচ্য/উত্তর আফ্রিকার (OECD) দেশসমূহ।

শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে ২০১৩ সালের ২ আগস্ট সিএনএন (CNN)-এ জানেল ডেভিস (Janel Davis) একটি ভাষ্য (Commentary) প্রচার করেন। উক্ত ভাষ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব লেবার-এর স্ট্যাটিসটিক্সের হিসেব মতে, "২০১২ সালে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া একজন শিক্ষার্থীর বার্ষিক আয় ছিল ২৪,৪৯২ মার্কিন ডলার, একজন উচ্চ বিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটের বার্ষিক আয় ছিল ৩৩,৯০৪ মার্কিন ডলার এবং কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের বার্ষিক আয় ছিল ৫৫,৪৩২ মার্কিন ডলার। উল্লিখিত আয় মূলত ২৫ বছরের অধিক বয়সী ব্যক্তির পূর্ণকালীন কাজের মজুরি/বেতনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য" (*Janel Davis, CNN, Educational Levels generally make a difference in earnings, commentary, date 02.08.2013; 12:00a.m*) দেখা যাচ্ছে যে, কর্মরতদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে আয় বৃদ্ধির সহসম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা ও আয়-ব্যয়

২০০০ সালে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে ৩ খণ্ডের একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করে। এতে দেখা যায় যে, "গড়ে সকল স্তরের ও ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে পূর্বগত (Foregone) আয়ের ১০% গৃহস্থালির ব্যক্তিগত (Private) প্রতিদান হিসেবে পাওয়া যেত" (*World Bank, 2000, Bangladesh Education Sector Review, vol. 1, p. 75*)। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিদানের বিষয়টি আরেকটু গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, "যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে পারেনি তাদের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীর গড় আয় ১৪.৩% বেশি। যারা জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত করেছে তারা ২১.৭% প্রতিদান (Rate of Return) পাচ্ছে। যার অর্থ দাড়াচ্ছে যারা জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেনি তাদের তুলনায় শিক্ষা সমাপ্তকারীরা প্রতিবছর অতিরিক্ত স্কুল শিক্ষার জন্য প্রায় ৭% অধিক প্রতিদান পাচ্ছে। ... মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের প্রতিদান হলো ১৫.৬% অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের তুলনায় প্রতিদান ১.৩% বেশি এবং জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাপ্তকারীদের তুলনায় ৬.১% কম। ... উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের গড় প্রতিদান ৭.৬% ... এবং ব্যাচেলার ডিগ্রি সমাপ্তকারীদের গড় প্রতিদান ৩০.৮%" (*Ibid, p. 75*)। দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক, জুনিয়র মাধ্যমিক ও ব্যাচেলর ডিগ্রি স্তরের শিক্ষায় বিনিয়োগ আয়ের উপর অত্যন্ত ধনাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ প্রাথমিক, জুনিয়র মাধ্যমিক ও ব্যাচেলর ডিগ্রি স্তরের শিক্ষার প্রতিদান তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে।

শিক্ষা মানুষের বা শ্রমশক্তির আয়কে প্রভাবিত করে। এটা দরিদ্র গৃহস্থালি এবং বিত্তবান/ধনী গৃহস্থালি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ১৯৯৭ সালের গ্রামীণ ও শহর এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী গৃহস্থালি প্রধানদের মাথাপিছু মাসিক আয়ের পরিসংখ্যানিক তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন রহমান (*Rahman A, 2002, Education for Development – Lessons from East Asia for Bangladesh, pp. 17, 72*)। উল্লিখিত সময়ের পরিসংখ্যান থেকে আরো একটি বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাহলো গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের দশম শ্রেণি বা তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারী খানা প্রধান মাসিক ৬১৮ টাকা আয় করলেও একই ধরনের শিক্ষা অর্জনকারী বিত্তবান/ধনী পরিবারের সদস্যের মাসিক আয় ১৪১৯ টাকা বা ১৩০% বেশি। আবার শহরের একই স্তরের শিক্ষা (দশম শ্রেণি ও ততোধিক) অর্জনকারী দরিদ্র পরিবারের খানা/গৃহস্থালি প্রধান ৬৫৫ টাকা আয় করলেও বিত্তবান/ধনী পরিবারের খানা প্রধানের আয় হলো ৩০৯৪ টাকা বা ৩৭২% বেশি। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে শিক্ষা আয় সমতা আনয়ন করে বলা হলেও সকলক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থান, বিত্ত এবং অন্যান্য আরো নানা উপাদান কাজ করে। সম্ভবত: এমন ধরনের অবস্থা বিশ্লেষণের পর অর্থনীতিবিদগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "Education is more effective in raising income when

it is combined with access to land and capital" (*Hossain M, Sen B and others (1994), Rural Poverty in Developing Asia, vol. 1, Bangladesh, India and Srilanka, Edited by MG Quibria, ADB, Manila, pp. 151-153*)

এমনও দেখা যাচ্ছে যে, একই ধরনের শিক্ষা প্রাপ্ত হলেও মহিলা ও পুরুষের মাঝে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ২০০০ সালের গ্রামীণ মাঠ পর্যায়ের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, "এইচএসসি ও তদুর্ধ্ব স্তর পাশ করা একজন পুরুষের দৈনিক আয় ১১৪.৩২ টাকা এবং একজন নারীর দৈনিক আয় ১০১.১৬ টাকা অর্থাৎ ১১.৫১% কম" (*বায়েস আ, হোসেন মা, ২০০৭, গ্রামের মানুষ ও গ্রামীণ অর্থনীতি- জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা, স্বরাজ প্রকাশনী, পৃ.* ২২১-২৩০)। সম্ভবত: এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের আয়ের ক্ষেত্রে ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে একই স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত দু'জনের মধ্যে একজন যে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তা দিয়ে মানুষের আয়, উৎপাদন বৃদ্ধি বা দারিদ্র্যের হ্রাসে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আবার এ রকমও দেখা যায় যে, একই শিক্ষা গ্রহণ করা দু'জন পুরুষের অন্তর্জাত সক্ষমতা (Innate ability), পারিবারিক, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি কারণে বেতন/পারিশ্রমিকের হারে তারতম্য হতে পারে।

সারণি- ৮: শিক্ষাস্তর ভেদে পরিবার প্রধানদের গড় মাথাপিছু আয় (টাকায়), ২০১০

অর্জিত শিক্ষাস্তর	জাতীয়		গ্রামীণ		শহুরে	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১৮০৭	২২৬২	১৭৩০	২০৬৫	২১৬১	৩২৪০
প্রথম–পঞ্চম শ্রেণি	২২০৫	৩২৯১	১৯৯৪	৩০১১	২৮২৮	৪১৪৭
৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণি	২৭১১	৩৩৫৬	২৪৯৯	৩১৪২	৩১৯২	৩৯৫৪
এসএসসি/এইচএসসি সমমান	৪০৯৮	৫৯৫৮	৩৩৪২	৬০৪১	৫১০৯	৫৮৮২
স্নাতক সমমান	৫৩২৭	৬১০৯	৩৮৮১	৫৮৮৩	৬২২০	৬১২১
স্নাতকোত্তর	৫৮০০	১০৬৭৪	৩৭৮৯	০	৬৬০৪	১০৬৭৪
ডাক্তার	২৪০৬৪	০	০	০	২৪০৬৪	০
প্রকৌশলী	১১৮২২	০	৫১৬৭	০	১২৬০৩	০
অন্যান্য	৫৪৭৭	২৮৬৮	২১৭১	০	৮৫২৭	৪১১৯
মোট	২৫১৭	৪১১৯	২০৮৩	২৫০৯	৩৭০৪	৪১০৭

Source: BBS (2011), Report of the Household Income and Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, pp. 95-96.

২০১০ সালের গৃহস্থালি আয় ব্যয় জরিপের পরিসংখ্যান (সারণি- ৮) থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে গৃহস্থালি প্রধানের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রাম, শহর ও জাতীয় পর্যায়ে একই ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রায় সকল স্তরেই একই ধরনের শিক্ষা অর্জনকারী পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক আয় করছে। বাংলাদেশের বাস্তব সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের সাথে এ ধরনের পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যয়ের প্রাথমিক উৎস হলো সরকারের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পদ। রাজস্ব খাতের অর্থ সরকার মূলত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব থেকে সংগ্রহ করে থাকে। দেশের বাহিরের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (যেমন- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ওপেকভূক্ত দেশসমূহ প্রভৃতি) ঋণ সাহায্য নিয়ে সরকার উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করে। অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীও শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করে থাকেন।

শিক্ষার্থীদের পুস্তক সরবরাহ, উপবৃত্তি প্রদান, দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ট্যালেন্টপুলে ও সাধারণ বৃত্তি সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানত ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। এসকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা (Operating) ব্যয় ও মূলধনী (Capital) ব্যয়ের জন্য সরকারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের সিংহভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষক ও অধ্যক্ষের বেতন প্রদান করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে এবং স্কুল ও কলেজের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সমবেতন ও সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। নারী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য, পরীক্ষার ফি, মেধাবী ছাত্রীদের জন্য সাধারণ বৃত্তি ও বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষায় বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে আইসিটি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে গৃহীত ব্যয়সমূহও শিক্ষা ব্যয় হিসেবে সরকারের মাধ্যমে বরাদ্দ হচ্ছে। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতও বিরাজমান রয়েছে, কিন্তু সরকারি খাতই মূলত প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

সরকারের ব্যয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরও অনেকগুলো শিক্ষা ব্যয় বহন করতে হয়। এই খাতগুলো হলো– প্রাইভেট টিউটর, স্টেশনারী, জ্বালানি, টিফিন, চিকিৎসা, স্কুল পোশাক ও অন্যান্য। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সুযোগ ব্যয়কে (Opportunity Cost) বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ২০০৬ সালের এক হিসেবে দেখা যাচেছ যে, "সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক ব্যক্তিগত/পারিবারিক ব্যয় ২৫৫৪ টাকা, বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত ব্যয় ২৪৩৮ টাকা, বেসরকারি (অরেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৩৯ টাকা, কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ১৬৮২ টাকা, বেসরকারি রেজিস্টার্ড মাদ্রাসায় ২৩২৪ টাকা, বেসরকারি অরেজিস্টার্ড মাদ্রাসায় ২০১৪ টাকা" (*Education watch 2006, Financing Primary and Secondary Education in Bangladesh, CAMPE, 2007, p. 42*)। উল্লিখিত সময়ে প্রতি মার্কিন ডলারের বাংলাদেশী মুদ্রায় মূল্যমান ছিল ৭০ টাকা। এ হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক গড় ব্যয় নির্ণয় করা যেতে পারে। এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের এবং ধনী ও দরিদ্রদের মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রতি বাৎসরিক সরকারি ব্যয়ও নগণ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২০০৫ সালে শিক্ষার্থী প্রতি গড়ে ব্যয় হয়েছে ''সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪.৭ মার্কিন ডলার, বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯.৫ মার্কিন ডলার, বেসরকারি (অরেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১.৩ মার্কিন ডলার, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ মার্কিন ডলার, রেজিস্টার্ডি মাদ্রাসায় ২৩.৬ ও অরেজিস্টার্ড মাদ্রাসায় ০.৯ মার্কিন ডলার" (*Ibid, p. 73*)। একই সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রতি গড়ে বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় হয়েছে "সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১২০৪ টাকা, বেসরকারি (এমপিওভূক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৫৭৪ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসায় ৫৬১১ টাকা" (*Ibid, p. 48*)। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রতি গড়ে বাৎসরিক সরকারি ব্যয় ৭৪.৭ মার্কিন ডলার, বেসরকারি (এমপিওভূক্ত) ৩৫.২ মার্কিন ডলার, মাদ্রাসায় ৫৪.৪ মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে (*Ibid, p. 73*)।

বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। উক্ত রিপোর্টে "শিক্ষার জন্য মোট জাতীয় আয়ের ৫% ব্যয় করার সুপারিশ করা হয় এবং পরবর্তীতে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে এই ব্যয়ের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের ৭% করার সুপারিশ করা হয়" (*খুদা, কুদরাত-এ (১৯৭৪), শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পুন: মুদ্রণ, (১৯৯৬), বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পৃ. ২৯৪*)।

বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম ২০১৫ সালে (In Incheon, Korea) "The Education 2030" এর ঘোষণায় "Has urged countries to increase their public spending for Education to at least 4-6% of GDP and/or at least 15-20% of total budget" (*Rahman, et.al (2016), Budget for Education in Bangladesh: An analysis of Trends, Gaps and Priorities" CPD, p. 5*).

কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের শিক্ষায় জিডিপি-র কতটুকু ব্যয় হচ্ছে? বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব মতে দেখা যায় যে, "১৯৭৩ -১৯৮০ সালে গড়ে জিডিপি-র ০.৯%, ১৯৮১-১৯৮৫ সালে গড়ে জিডিপি-র ১.০%, ১৯৮৬-১৯৯০ সালে গড়ে জিডিপি-র ১.৩%, ১৯৯১ সালে জিডিপি-র ১.২%, ১৯৯৫ সালে জিডিপি-র ২.৪%", ১৯৯৮ সালে জিডিপি-র ২.২% সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় (*World Bank 2000, Bangladesh Education Sector Review, vol.1, p. 63*)।

এশিয়া প্যাসিফিক রাষ্ট্রসমূহের ২০০০ সালের তথ্য মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, "উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি-র ১.৪% এবং ২০০৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি-র ২.২% শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছিল। ২০০০ সালে সরকারি সমগ্র ব্যয়ের ১৫.০% এবং ২০০৯ সালে সমগ্র সরকারি ব্যয়ের ১৪.১% শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছিল" (*Ministry of Finance, 2003, Bangladesh Economic Review, p. 139, Statistical Year Book of Asia and the Pacific 2013, p. 100*)। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FY 2016-FY 2020) দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "২০১৫ সালে সরকারি সামগ্রিক ব্যয়ের ১২.৩% এবং জিডিপি-র ২.৩% শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে" (*GED, 2015, 7th Five Year Plan FY 2016-FY 2020, Planning Commission, p. 529*)

শিক্ষাখাতে সামগ্রিক সরকারি ব্যয় এবং জিডিপি ব্যয়ের হিসেবে দেখা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের দুর্বল অবস্থান সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও নারী শিক্ষায় বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জিডিপি-র ৫%-৭% ব্যয় করা সম্ভব হলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে যা ভবিষ্যতে এদেশে জ্ঞান-নির্ভর (Knowledge based) অর্থনীতি গড়তে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. এশিয়ার দেশসমূহে কোন স্তরের শিক্ষার সামাজিক প্রতিদান অধিক?
ক. উচ্চতর
খ. প্রাথমিক
গ. মাধ্যমিক
ঘ. কোনটিতেই নয়

২. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন শিক্ষাখাতে জিডিপি-র কত শতাংশ ব্যয়ের সুপারিশ করেছেন?
ক. ৩%
খ. ৪%
গ. ৫%
ঘ. ৬%

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষা ও আয়ের সম্পর্ক লিখুন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষায় জিডিপি-এর কতটুকু ব্যয় হচ্ছে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আয়ের উপর শিক্ষার ধনাত্মক প্রভাব সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মতামতগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়ের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করুন।

পাঠ ৬.৬: শিক্ষা-সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ
Education Savings and Investment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সঞ্চয় ও মূলধনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সঞ্চয় বৃদ্ধির হার এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাস্তরের সাথে বিনিয়োগের সহ-সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

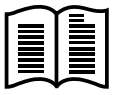

শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে– এ সম্পর্কে আপনারা পূর্ববর্তী অধিবেশনে/পাঠে জানতে পেরেছেন। শিক্ষা স্তরের সাথে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ২০১০ সালের গৃহস্থালি আয় এবং ব্যয় জরিপের তথ্য বর্তমান পাঠে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী ব্যয়ের পরিসংখ্যান ২০১০ সালে উক্ত জরিপ থেকে বের করা প্রায় দু:সাধ্য হওয়ায় বিকল্প পথ বেছে নেয়া হচ্ছে। বিকল্প পথটি হলো ১৯৯৯ সাল ও ২০০৪ সালের দারিদ্র্য পর্যবেক্ষণ (Monitoring) জরিপের রিপোর্ট থেকে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান ব্যবহার করে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী উল্লিখিত সময়ের সঞ্চয় (Savings) হিসেব করে নির্ণয় করা হয়েছে। বিভিন্ন মানুষ বা ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে সঞ্চয় করে থাকেন। সঞ্চয় হতে পারে পারিবারিক কোন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে, বৃদ্ধ বয়সের জন্য, ছুটিকালীন সময়ে বিনোদনের জন্য, সন্তানের শিক্ষার জন্য অথবা লাভজনক কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য। সঞ্চয়কে স্যামুয়েলসন সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "The amount of saving is measured by the difference between net real income and consumption" (*Samulson P. A., 1976, Economics, MC Graw Hill Book Company, p. 206*) অর্থাৎ Saving= Net real income – consumption expenditure. অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের আয় থেকেই সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রকৃত আয়ের একটা অংশ মানুষ ভোগ করে এবং বাকী অংশ ভবিষ্যৎ ভোগ/বিনিয়োগের জন্য রেখে দেন এবং এই রেখে দেয়া অংশকেই অর্থনীতিতে সঞ্চয় বলা হয়। সঞ্চয়কে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। $x = y-z$, এখানে, x = সঞ্চয়, y = প্রকৃত আয়, z = ভোগকৃত ব্যয়।

উল্লিখিত সমীকরণের সাহায্যে নিম্নের সারণিতে (সারণি-৯) ১৯৯৯ সাল ও ২০০৪ সালের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বাংলাদেশে মাসিক মাথাপিছু সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের হার নির্ণয় করা হয়েছে।

সারণি- ৯ এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে–

প্রথমত: যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারীদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের হার (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) অধিক।

সারণি- ৯: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের হার

শিক্ষাস্তর	১৯৯৯				২০০৪			
	মাথাপিছু মাসিক আয়	মাথাপিছু মাসিক ব্যয়	মাথাপিছু মাসিক সঞ্চয়	মাথাপিছু মাসিক সঞ্চয়ের হার	মাথাপিছু মাসিক আয়	মাথাপিছু মাসিক ব্যয়	মাথাপিছু মাসিক সঞ্চয়	মাথাপিছু মাসিক সঞ্চয়ের হার
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	৭২৯	৬২১	১০৮	১৪.৮	৭৭৯	৭০১	৭৮	১০.০
প্রথম–পঞ্চম শ্রেণি	৮৭৫	৭৮৬	৮৯	১০.২	১০৩৫	৮৭৮	১৫৭	১৫.২
ষষ্ঠ-নবম শ্রেণি	১০৯২	৯৪২	১৫০	১৩.৭	১১৯৪	১০৯৬	৯৮	৮.২
এসএসসি/এইচএসসি/ সমমান	১৪৭১	১২৪৮	২২৩	১৫.২	১৮২৩	১৫০৬	৩১৭	১৭.৪
কারিগরি ডিপ্লোমা	২১৫৯	১৮৩৮	৩২১	১৪.৯	৩১৯৯	২৩০১	৮৯৮	২৮.১
গ্র্যাজুয়েট/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট	২৫৮৫	১৮৩৩	৭৫২	২৯.১	২৯৮৩	২৬৪৩	৩৪০	১১.৪
স্নাতক / স্নাতকোত্তর (কারিগরি)	২৪৯২	২১৫৫	৩৩৭	১৩.৫	৪০২১	৪৩৫৪	-৩৩৩	-৮.৩

Source: BBS (2002), Poverty Monitoring Survey 1999, p. 238 and BBS (2004), Report of the Poverty Monitoring Survey 2004, p. 186. The Savings rate was estimated with savings as percent of income of different level education completers.

দ্বিতীয়ত: শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয়ত: শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতাকে শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

চতুর্থত: শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধির সক্ষমতা শিক্ষা গ্রহণকারীদের অধিকতর পরিমাণ পণ্য/ উপযোগ ভোগে সক্ষম করে তোলে।

পঞ্চমত: উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণকারীদের অধিক সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ষষ্ঠত: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাপ্তদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা আয় বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যা সম্ভব হচ্ছে শিক্ষা প্রাপ্তদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। এভাবে আয় বৃদ্ধি, বেতন (Wages) বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা অর্থনৈতিক অসমতা/বৈষম্য কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সপ্তমত: শিক্ষা সঞ্চয় সৃষ্টি, বৃদ্ধিতে অবদান রেখে স্থানীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, নিয়োজন, উৎপাদন, ভোগ, আয় বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

শিক্ষা ও গৃহস্থালির/পরিবারের বিনিয়োগ

সঞ্চিত আয় (Saving) মূলধন গঠনের কাজে ব্যয় করাকে বিনিয়োগ বলে। অর্থনীতিতে মূলধন বলতে উৎপাদিত দ্রব্যের সেই অংশকেই বোঝানো হয় যা অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় ও নিয়োজিত থাকে। সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফল হলো মূলধন। অধিকতর দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার লক্ষ্যে দেশের বর্তমান মূলধন সামগ্রীর সাথে নতুন মূলধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি সংযোজিত হলেই তাকে বিনিয়োগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। প্রশ্ন হলো শিক্ষা গৃহস্থালির (Households) বিনিয়োগকে কী প্রভাবিত করছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান নেই।

সারণি- ১০: গৃহস্থালি প্রধানের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বিনিয়োগ, ১৯৯৭-১৯৯৯

গৃহস্থালি প্রধানের শিক্ষাস্তর	মোট গৃহস্থালি (০০০)	বিনিয়োগ-কৃত গৃহস্থালি (০০০)	বিনিয়োগ-কৃত গৃহস্থালির হার (%)	১৯৯৭-৯৮ সাল			১৯৯৮-১৯৯৯ সাল		
				মোট বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	বিনিয়োগের হার (%)	গৃহস্থালির গড় বিনিয়োগ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	বিনিয়োগের হার (%)	গৃহস্থালির গড় বিনিয়োগ (টাকা)
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১২০৬৭ (৪৯.১০%)	৯১৬৩	৪৯.২০	৭৭৩৯৯	২৩.৩৮	৮৪৪৬.৯০	৮৪৩৬৬	২২.১৩	৯২০৭.২৫
প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি	৫৮৯০ (২৩.৯৭)	৪৫৭৪	২৪.৫৬	৬২৭৫১	১৮.৯৫	১৩৭১৯.০৬	৮৬৯১৯	২২.৮০	১৯০০২.৮৪
ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি	৩৪৪৬ (১৪.০৩)	২৬৭৭	১৪.৩৭	৭৫১৯৫	২২.৭১	২৮০৮৯.২৮	৮০১৯৬	২১.০৩	২৯৯৫৭.৪২
এসএসসি /এইচএস সি	২২১৫ (৯.০১%)	১৬৫৩	৮.৮৭	৯০০১১	২৭.১৯	৫৪৪৫৩.১১	১০১৪০৪	২৬.৫৯	৬১৩৪৫.৪৩
স্নাতক ও তদুর্ধ্ব	৯৫৬ (৩.৮৯%)	৫৫৮	৩.০০	২৫৭২৯	৭.৭৭	৪৬১০৯.৩২	২৮৪১৯	৭.৪৫	৫০৯৩০.১১
মোট	২৪৫৭৪ (১০০.০০%)	১৮৬২৫	১০০.০০	৩৩১০৮৫	১০০.০০	১৭৭৭৬.৩৭	৩৮১৩০৪	১০০.০০	২০৪৭২.৭০

Source: Compilled and calculated from BBS(2007), Preliminary Report on Household Investment Survey-1998-99, p. 70; বন্ধনীতে মোট গৃহস্থালির শতকরা হার (%) নির্ণয় করা হয়েছে। সাথে বিনিয়োগের নির্ভরতা বিশ্লেষণের জন্য পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৮-৯৯ সালে (সর্বশেষ) পরিসংখ্যানসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০২ সালের মে মাসে "Preliminary Report on Household Investment Survey 1998-1999" প্রকাশ করে। উল্লিখিত রিপোর্টের পর আর কোন "Household Investment Survey" রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। তাই শিক্ষার সাথে বিনিয়োগের নির্ভরতা বিশ্লেষণের জন্য পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের (সর্বশেষ) পরিসংখ্যানসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণির পরিসংখ্যানসমূহ থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া যায়–

এক– উল্লিখিত সময়কালে প্রায় অর্ধেক (৪৯.২০%) বিনিয়োগকারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। এসএসসি ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিনিয়োগকারীর হার নিতান্তই কম (১১.৮৭%)। কিন্তু তাদের বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩৫%।

দুই– প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যাদের নেই তাদের গৃহস্থালির গড় বিনিয়োগ সর্বাপেক্ষা কম। স্নাতক ও তদুর্ধ্ব স্তর ব্যতীত (এটি একটি ব্যতিক্রম) শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাস্তর নির্বিশেষে সকল পর্যায়েই বছরান্তে গৃহস্থালির গড় বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষা ও গৃহস্থালির/পরিবারের খাতওয়ারী বিনিয়োগ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন বিনিয়োগকারীরা ১৯৯৭-৯৮ সালে তাদের বিনিয়োগের ৪০.৬৪% (সারণি-১১) এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে ৩৮.৫৬% গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যয় করেছে। এ বিনিয়োগকারীদের নিকট দ্বিতীয় ও তৃতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি ও সেচ সেক্টরকে দেখা যাচ্ছে। প্রথম থেকে পঞ্চম

শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিনিয়োগকারী পরিবার প্রধানগণ ১৯৯৭-৯৮ সালে তাদের বিনিয়োগের ৩৫.৮৭% গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ খাতে, ৩৩.৩৫% ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে, ১০.০৫% কৃষি ও সেচ খাতে, ৫.১৫% ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারী পরিবার প্রধানদের নিকট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পঞ্চম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হলো মৎস্য এবং ষষ্ঠ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হলো যানবাহন। ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারী পরিবার প্রধানগণ বিনিয়োগের ৩১.২২% ব্যবসা-বাণিজ্যে, ২৬.৩২% গৃহ ও নির্মাণ খাতে, ২২.৩১% যানবাহন খাতে, ৬.৫০% কৃষি ও সেচ খাতে, ৩.৮৮% ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে, ৩.৫১% মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারী পরিবার প্রধানদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাহলো–তুলনামূলকভাবে অধিক আয় উৎপাদনকারী খাতগুলোকে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করা। এক্ষেত্রে ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারী পরিবার প্রধানদের যানবাহন খাতে বিনিয়োগের প্রতি লক্ষ্য করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এখানেই সম্ভবত: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সারণি-১১ এর পরিসংখ্যানসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষাস্তর নির্বিশেষে সকল বিনিয়োগকারী গৃহ ও নির্মাণ খাতকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কোন কোন বিনিয়োগকারীর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী খাত হলেও শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিনিয়োগের মূল খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে মানুষের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সামাজিকীকরণ, তথ্য ও প্রযুক্তি গ্রহণ, লাভজনকতা সম্পর্কে ধারণা, সমাজ ও মানুষের মাঝে নিজেকে উপস্থাপনের ধরন প্রভৃতিকে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে উচ্চস্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিনিয়োগকারীরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়। সামগ্রিক বিনিয়োগকৃত অর্থের ক্ষেত্রে দেখা যায় এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে রয়েছেন। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে বিনিয়োগকারীদের কৃষি এবং সেচ, আবাদ, মৎস্য, পশুপালন ও পোল্ট্রিতে বিনিয়োগের গতি হ্রাসের প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধির প্রবনতা দেখা যায়। তবে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত শিক্ষিত বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ সঠিকভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। হতে পারে যে, বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের মাঝে এখনো শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার চরিত্র/মানসিকতা সঠিকভাবে গড়ে উঠেনি। কিন্তু তবুও বলা যায় যে, ব্যবসা ও অন্যান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজি/মূলধন সঞ্চয়নে সফল হলে শিক্ষিত বিনিয়োগকারীদের ভেতর থেকে অনেক সফল শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি- ১১: গৃহস্থালি প্রধানের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে (Sectors) গৃহস্থালির বিনিয়োগ, ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯

গৃহস্থালি প্রধানদের শিক্ষা	মোট গৃহস্থালি (০০০)	বিনিয়োগকৃত গৃহস্থালি (০০০)	সেক্টর											
			গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ	কৃষি ও সেচ	আবাদ	মৎস্য	পশুপালন	পোল্ট্রি	যানবাহন	ব্যবসা-বাণিজ্য	ম্যানুফ্যাক-চারিং	স্বাস্থ্য ও শিক্ষা	অন্যান্য	মোট বিনিয়োগ
১৯৯৭-৯৮														
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১২০৬৭	৯১৬৩	৩১৪৫২ (৩৪৩২.৫০)	৭৬৬৫ (৮৩৬.৫১)	১০৭৪ (১১৭.২১)	২৩৫৫ (২৫৭.০১)	৩৩১৪ (৩৬১.৬৭)	১৪৫৬ (১৫৮.৯০)	২২৪২ (২৪৪.৬৭)	২৩৯৮৪ (২৬১৭.৪৮)	২৩২৩ (২৫৩.৫১)	০	১৫৩৩	৭৭৩৯৯
১ম-৫ম	৫৮৯০	৪৫৭৪	২২৫১২ (৪৯২১.৭৩)	৬৩০৯	৯০০	২৫৩৭	১৮১৭	১০৮১	২৪৫১	২০৯২৭ (৪৫৭৫.২১)	৩২৩৩	২	৯৮২	৬২৭৫১
৬ষ্ঠ-১০ম	৩৪৪৬	২৬৭৭	২০৭৩১ (৭৭৪৪.১১)	৩৭৬০	১২২৬	৩১০৬	১৭৫৭	১৭৪৭	৬০১১	৩৪৩৬৪ (১২৮৩৬.৭৫)	৯১১	৫৭	১৪৭৩	৭৫১৯৫
এসএসসি/ এইচএসসি বা সমমান	২২১৫	১৬৫৩	২২০৬৫ (১৩৩৪৮.৪৫)	২৩৬৪ (১৪৩০.১২)	৬৭৪ (৪০৭.৭৪)	১৯৫৬ (১১৮৩.৩০)	৭৫৭ (৪৫৭.৯৬)	৭৪৬ (৪৫১.৩০)	২০৩৩০ (১২২৯৮.৮৫)	৩৭৯৪০ (২২৯৫২.২০)	১০৬৬ (৬৪৪.৮৮)	৩৩৭ (২০৩.৮৭)	১৭৭৭	৯০০১১
স্নাতক বা তদুর্ধ্ব	৯৫৬	৫৫৮	৮৯৩৮ (১৬০১৭.৯২)	৬১৫ (১১০২.১৪)	২৪৪ (৪৩৭.২৮)	৮৩৪ (১৪৪০.৮৬)	৩০৮ (৫৫১.৯৭)	১১৪ (২০৪.৩০)	১৪৮২ (২৬৫৫.৯১)	১১৪৪৫ (২০৫১০.৭৫)	১৭৭ (৩১৭.২০)	৩৯০ (৬৯৮.৯২)	১২১৩	২৫৭২৯
মোট	২৪৫৭৫	১৮৬২৪	১০৫৬৯৮	২০৭১২	৪১৬৯	১০৭৫৮	৭৯৫৩	৫১৪৪	৩২৫১৭	১২৮৬৬১	৭৭১০	৭৮৬	৬৯৭৮	৩৩১০৮৬
১৯৯৮-৯৯														
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১২০৬৭	৯১৬৩	৩২৫৩৩ (৩৫৫০.৪৭)	৮১১৩ (৮৮৫.৪০)	১৮৮৫ (২০৫.৭১)	২৪৬৬ (২৬৯.১৩)	৩০৭২ (৩৩৫.২৬)	৭৯৮ (৮৭.০৮)	৪৩৭৩ (৪৭৭.২৫)	২৫৫৬৭ (২৭৯০.২৪)	৩২৯০ (৩৫৯.০৫)	২৪৮ (২৭.০৬)	২০২০	৮৪৩৬৬
১ম-৫ম	৫৮৯০	৪৫৭৪	২২৮৭৭ (৫০০১-৫৩)	৫৬৫৪	৮৬২	৩০৪৭	২০২৭	১২৩০	১৯৩৯৪ (৪২৪০.০৫)	২৭১৩৫ (৫৯৩২.৪৪)	৩৩৭২	২	১৩১৮	৮৬৯১৯
৬ষ্ঠ-১০ম	৩৪৪৬	২৬৭৭	১৯৮৪২ (৭৪১২.০৩)	৩৮৯৪	১২৪৭	৩৬১৯	১৮৪১	১৭৪১	৫১৭৬	৩৯৯১৫ (১৪৯১০.৩৫)	১৫৫৩	৫৭	১৩১২	৮০১৯৬
এসএসসি / এইচএসসি বা সমমান	২২১৫	১৬৫৩	২৭৪৭৭ (১৬৬২২.৫০)	২৭২৩ (১৬৪৭.৩০)	৭০৭ (৪২৭.৭০)	২১১৩ (১২৭৮.৮১)	৯০৯ (৫৪৯.৯১)	৪৮৪ (২৯২.৮০)	৮৯৬৫ (৫৪২৩.৪৭)	৫১১৪৫ (৩০৯৪০.০৭)	৫২৪৫ (৩১৭৩.০১)	৩৯৬ (২৩৯.৫৬)	১২৩৯	১০১৪০৪
স্নাতক বা তদুর্ধ্ব	৯৫৬	৫৫৮	১০৪৫৭ (১৮৭৪০.১৪)	৮৫৮ (১৫৩৭.৬৩)	২৭৬ (৪৯৪.৬২)	৭৯০ (১৪১৫.৭৭)	৩১৯ (৫৭১.৬৮)	১৩৮ (২৪৭.৩১)	৬৯৮ (১১৭৯.২১)	১২২৬৬ (২১৯৮২.০৭)	১৫১৬ (২৭১৬.৮৪)	২৩৯ (৪২৮.৩১)	৯০৩	২৮৪১৯
মোট	২৪৫৭৫	১৮৬২৪	১১৩১৮৬	২১২৪৩	৪৯৭৭	১২০৩৬	৮১৬৯	৪৩৯২	৩৮৫৬৫	১৫৬০২৮	১৪৯৭৬	৯৪১	৬৭৯২	৩৮১৩০৫

Source: Compilled and calculated from BBS (2002), Preliminary Report on Household Investment Survey 1998-99, pp. 142.43

নোট: বন্ধনীতে সংখ্যাগুলো প্রতি গৃহস্থালির গড় বিনিয়োগ নির্দেশ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

ক. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. মানুষের প্রকৃত আয়ের একটা অংশ মানুষ ভোগ করে।
২. উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণকারীদের অধিক সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
৩. বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের মাঝে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা সঠিকভাবে গড়ে উঠেছে।

সঠিক উত্তরঃ ১। সত্য; ২। সত্য; ৩। মিথ্যা।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়?
২. বিনিয়োগ বলতে কী বোঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সঞ্চয় বৃদ্ধির হার এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষাস্তরের সাথে বিনিয়োগের সহ-সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.৭: শিক্ষা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন
Education and Rural Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা এবং এর এ্যাপ্রোচসমূহের সবলতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল খাতসমূহ চিহ্নিত করতে এবং গ্রামীণ এলাকায় নিয়োজিত/অনিয়োজিত শ্রমশক্তির গতি-প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষার সাথে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হ্রাস/বৃদ্ধির সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্তনে শিক্ষার বিভিন্নমুখী ধনাত্মক প্রভাব সম্পর্কে বিবৃত করতে পারবেন।

গ্রামীণ উন্নয়ন ধারণা

গ্রামীণ উন্নয়নের সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা বা ধারণা আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়, দর্শন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি বিভিন্নভাবে গ্রামীণ উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। গ্রামীণ উন্নয়ন হিসেবে কারো কারো বিবেচনায় বিশেষ জাতীয় সমস্যাসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয় আবার কেউবা আত্মনিষ্ঠ (Subjective) দৃষ্টিভঙ্গি, অগ্রাধিকার, কৌশলসমূহকে এতে প্রতিফলিত করেন। ১৯৭৫ সালে বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হলো,

"Rural development as a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of people - the rural poor. Accordingly, it involves extending the benefits of development to the poorest among those live in rural areas. This group includes small scale farmers, tenants and landless" (*World Bank, 1975, Rural development: sector policy paper; quoted in Navaratnam, K.K., 1986, Role of Education in Rural Development: A Key Factor for Developing Countries, Blacksburg, USA, p. 3*)

তবে গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণাকে কেবল গ্রামের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র চাষী, বর্গাচাষী এবং ভূমিহীনদের উন্নয়নের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার কোন সুযোগ নেই। গ্রামের ভৌত অবকাঠামো বা সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হলে তা গ্রামে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীরই উন্নয়ন ঘটাতে পারে। গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রামীণ মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি; দারিদ্র্য বিমোচন, আয়ের সমতামুখী বিতরণ, অনিয়োজন হ্রাসকরণ, শিক্ষাব্যবস্থা উন্নতকরণ এবং সকলের শিক্ষাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য স্যানিটারী ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতকরণ, কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত খাতের উৎপাদনের জন্য বিভিন্নমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নতকরণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণাটি হলো সমন্বিত (Integrated) ও বিশাল। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Micro এবং Macro স্তরের/পর্যায়ের সমাধান পদ্ধতি (Approach) যার মাঝে রয়েছে বিস্তৃত ধরনের উদ্দেশ্য ও কৌশল। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রথম এ্যাপ্রোচটিকে বলা হয় উৎপাদনমুখী এ্যাপ্রোচ- যা উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য বীজ, রাসায়নিক সার, সেচ, কীটনাশক, কৃষি ঋণ, বাজারজাতকরণ ও অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক সংখ্যক কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ এ্যাপ্রোচটিতে গ্রামীণ কৃষি উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির

প্রতি সামান্য পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করায় এবং গ্রামীণ সমাজে অসমতা/বৈষম্য বৃদ্ধি করায় এটি সমালোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় এ্যাপ্রোচটির নামকরণ হয়েছে ''দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন"। এতে গ্রামীণ সমাজের সর্বাপেক্ষা সুবিধাবঞ্চিত অবস্থানে থাকা পরিবারগুলোর সমস্যা উপশমে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি পরিবারের নিম্নতম (Minimum) খাদ্য এবং পুষ্টি, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, যানবাহন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সংস্থান, মৌলিক চাহিদা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতি এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই এ্যাপ্রোচটিও সমালোচিত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর উন্নয়নের "চুঁইয়ে পড়া প্রভাব" (Trickle down effect) নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অর্থলগ্নীকারক (Money-lenders), অধিকতর ভাল অবস্থানে থাকা কৃষকদের (Better off farmers) সহায়তা করে। তাই মাঝে মাঝে টেকসই উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদাপূরণ এবং দারিদ্র্য নির্মূলকরণের মধ্যকার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসাধ্য হয়ে যায়।

প্রকল্প নির্ভর পদ্ধতি (Project-based approach)-কে তৃতীয় পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে গ্রামীণ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে এনজিওদের (NGO) দ্বারা অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বেশকিছু সংখ্যক প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করা হয়। এসকল প্রকল্পের অধিকাংশেরই দায়িত্ব গ্রহণ করে (Sponsor) বিদেশী কোন উন্নয়ন সংস্থা। ফলে এই প্রকল্পগুলো "Tend to reflect the philosophy, convictions, interests and constraints of their spiritual and financial sponsors" (*Khan Q., 2002, Managing Education for Rural Development: Fitting the task of the needs"; National Institute of Educational Planning and Administration, Vol.-XVI, No. 1, New Delhi, India, pp. 5-29*).

চতুর্থ এ্যাপ্রোচ/পদ্ধতি হলো "দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ রূপান্তর"। এতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক (Periphery) সিদ্ধান্তের তুলনায় কেন্দ্রের (Center) সিদ্ধান্তের উপর অধিকতর নির্ভর করা হয়। এটা হলো "উপর-নিচ" (Top-down) আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক এ্যাপ্রোচ কেন্দ্র থেকে প্রান্তে (Center to the Periphery) গমন করে। যে সকল দেশ নিচের থেকে জনগণের অংশগ্রহণ এবং শিক্ষাসহ অদমনমূলক ও আমলাতন্ত্র বহির্ভূত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, সেসকল দেশ ''দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ রূপান্তর" সাধনে সফল হয়েছে। কিন্তু আমলা এবং প্রশাসকদের উপর নির্ভরতার কারণে "উপর-নিচ" এ্যাপ্রোচ গ্রামীণ উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে উৎপাদনমুখী, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রকল্প নির্ভর এ্যাপ্রোচ এবং দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ রূপান্তর এর উপাদানসমূহের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। উপরোল্লিখিত বিভিন্ন এ্যাপ্রোচের উপাদানসমূহ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া), সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের (এনজিও) মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

সুতরাং গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি প্রভৃতির সমন্বিত ও বিশাল/ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে বোঝানো হয় যা থেকে গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার গুণগতমান উন্নয়নে সক্ষম হয়।

গ্রামীণ অর্থনীতির খাতসমূহ

এক সময় গ্রামীণ অর্থনীতি বলতে সাধারণত গ্রামীণ কৃষিকেই ধারণা করা হতো। জাতীয় জিডিপিতে শস্য ছাড়াও বন, মৎস্য ও পশুপালনকে কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাত ছাড়াও রয়েছে– ব্যবসা

বাণিজ্য, পেশাভিত্তিক বেতন ও মজুরি, গৃহায়ন সেবা, দান ও অভিবাসী আয় এবং অন্যান্য খাত। ২০১০ সালের গৃহস্থালি আয়-ব্যয় জরিপের রিপোর্টের তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, গ্রামীণ আয়ের ২৯.৭০% কৃষি থেকে, ১৫.০৫% ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে, ২৯.৫৭% পেশাভিত্তিক বেতন ও মজুরি থেকে, ৫.১৮% গৃহায়ন সেবা থেকে, ১৭.২৮% দান এবং অভিবাসী আয় ও ৩.১৬% অন্যান্য খাত থেকে অর্জিত হয়" (*BBS, 2011, Report of the household income & expenditure survey, Ministry of Planning, p. 32*)। সুতরাং গ্রামীণ উন্নয়ন অধ্যয়নের সময় কৃষি খাত ব্যতীত গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য খাতগুলো সম্পর্কেও মনোযোগ রাখতে হবে।

গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষিত শ্রমশক্তি, নিয়োজন ও অনিয়োজন

২০১৩ সালে সম্পন্ন শ্রমশক্তি জরিপের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, এসময়ে বাংলাদেশে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সের শ্রমশক্তির সংখ্যা ৬০.৬৬ মিলিয়ন এবং তন্মধ্যে ৪৩.৫১ মিলিয়ন (৭১.৭৩%) গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমশক্তির ৬৬.৬২% গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত রয়েছে (*BBS, 2015, Labour force survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, pp. 45, 55*)।

দেখা যাচ্ছে যে, আজো গ্রাম বাংলাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমশক্তি বসবাস করছে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মকান্ডে "জাতীয়ভাবে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ২১.৩% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এবং গ্রামীণ এলাকায় নিয়োজিত ২৭.৪% শ্রমশক্তির কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, ৩৯.১% এর প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে, ২৮.৩% এর মাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে ৯.৯% এর, উচ্চ শিক্ষা রয়েছে ২.৬% শ্রমশক্তির এবং ০.৫% এর অন্যান্য শিক্ষা রয়েছে" (*Ibid, pp. 55-56*)।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির শিক্ষার স্তর অনুযায়ী পেশাগত অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের মধ্যে ৫৩.৯% দক্ষ কৃষিকাজ, বনায়ন ও মৎস্য উৎপাদন/শিকার-এর কাজে, ২৩.৬% প্রাথমিক পেশায়, ১০.৪% সেবা ও বিক্রয়কর্মী হিসেবে, ৮.৫% দক্ষতা নির্ভর ব্যবসায়ের শ্রমিক, ২.৭% শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চালক ও সংযোজনকারী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি ও প্রাথমিক/মৌলিক পেশায় নিয়োজন হ্রাসের প্রবণতা এবং ব্যবস্থাপক, পেশাজীবি, সেবা ও বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে (*Ibid, pp. 56-57*)। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ও স্বল্প শিক্ষাগ্রহণকারী শ্রমশক্তি কৃষিসহ অধিক পরিশ্রমী পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণকারী শ্রমশক্তি চাকুরি/সেবা, শিল্প প্রতিষ্ঠানেই নিয়োজন গ্রহণ করছে। এভাবে শিক্ষিত গ্রামীণ শ্রমশক্তি অকৃষি কর্মকান্ডকেই নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে সচেষ্ট রয়েছে। শিক্ষাস্তর যত বাড়ছে অকৃষিতে সম্পৃক্ততা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে গ্রামীণ শিক্ষিত শ্রমশক্তি গ্রামীণ অকৃষি কাজে নিয়োজনের মাধ্যমে গ্রামীণ উৎপাদন ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে অনিয়োজনের হার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের রিপোর্টে দেখা যায় যে, "গ্রাম এলাকায় যারা (পুরুষ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের মাঝে অনিয়োজনের হার ১.৯%, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারীদের (পুরুষ) মাঝে অনিয়োজনের হার ৬.৬%, নারীদের মাঝে যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি তাদের অনিয়োজনের হার ৫.৬% এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী নারীদের অনিয়োজনের হার ২৩.২%"(*Ibid, p. 76*)। গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সমন্বয়তার অভাব রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তবে শিক্ষা গ্রামীণ নিয়োজন ও আয় বৃদ্ধিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ রয়েছে এবং এর ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যকার আয় ও উন্নয়ন জনিত ব্যবধান হ্রাস করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের উপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। সারণি-৩ থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য গ্রামীণ সাক্ষরহীনদের তুলনায় কম হিসেবে পরিসংখ্যানিকভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। আবার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের দারিদ্র্য হার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারীদের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ "দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম জিয়ন কাঠি হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া কোন সমাজ বা জাতি ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিতে সফলতা খুঁজে পায় না" (*বায়েস আ., হোসেন মা, ২০০৭, গ্রামীণ মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি: জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা, পৃ. ৪৭১*)।

আবার শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা মানুষের জীবনের গুণগত পরিবর্তন করে। শিক্ষাই হলো মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) এবং মানব দারিদ্র্য সূচকের (HPI) অবিচ্ছেদ্য অংশ। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে মানব পুঁজি গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব পুঁজিকে তিনটি সূচকের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। "প্রথমত: গৃহস্থালি/পরিবার প্রধানের অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাস্তর, দ্বিতীয়ত: গৃহস্থালি/পরিবার প্রধানের প্রায়োগিক সাক্ষর জ্ঞান (Literacy), তৃতীয়ত: পরিবার প্রধানের স্বামী বা স্ত্রীর অর্জিত শিক্ষা স্তর" (*BIDS, 2001, Fighting Human Poverty: Bangladesh Human Development Report 2000, p. 34*)। শিক্ষার প্রাপ্যতা/প্রবেশগম্যতা সাপেক্ষে উপরিল্লিখিত তিনটি সূচকই দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে। কেবল আয়-বৃদ্ধি ছাড়াও আন্তবংশীয় দারিদ্র্য নিরসন, আন্তবংশীয় শিক্ষা বৃদ্ধি, সামাজিক ক্ষমতায়ন, বিচার দারিদ্র্য নিরসন, সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আয় সমতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যাপক অবদান রাখে। বায়েস ও হোসেনের মতে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে তিনটি বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। "একটি হচ্ছে শিক্ষায় দরিদ্রদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বর্গাবাজারের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলোকে অধিকতর সক্ষম করে তোলা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বিদ্যমান খাস জমি অতি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা। প্রথম এবং তৃতীয় কাজ মূলত রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। কারণ মৌলিক শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা মানুষের শাসনতান্ত্রিক অধিকার" (*বায়েস, হোসেন, পৃ. ৪৭২*)। যদি সঠিকভাবে দরিদ্রদের শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্রুতগতিতে লাঘব করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

গ্রামীণ উন্নয়নে শিক্ষার আরো বিভিন্ন প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

গ্রামীণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি: আধুনিক কালের গ্রামগুলোতে নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এসকল সমস্যা শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন, শিক্ষা বিস্তার তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি নানা ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ ও শহর এলাকার মাঝে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ব্যবধান (Gap) বিরাজ করে। ফলে রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতা বাড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সরকার ও জনগণের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত, শিক্ষায় সহজভাবে প্রবেশগম্যতা ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে অধিকহারে সম্পৃক্ত করতে, গ্রামীণ সাংস্কৃতকি ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। গ্রামীণ পরিবেশ, জীবন ব্যবস্থা, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে গ্রামীণ জনগণ গ্রামের উন্নয়নে অবদান রাখতে উৎসাহ বোধ করবে।

গ্রামীণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি: ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাপ্ত শ্রমশক্তির ৬৬.৬২% গ্রামেই কর্মরত রয়েছে। গ্রামে অবস্থানকারী শিক্ষাপ্রাপ্তরা গ্রামের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা, অধিকার, সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রভৃতি জোরদারে সক্ষম হচ্ছে।

এভাবে গ্রামীণ সমাজের জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের কমিউনিটির কার্যকর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

গ্রামীণ ও শহরের খাতসমূহের সেতুবন্ধনঃ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন। শিক্ষা গ্রামের মানুষের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের চাহিদা মিটাতে সচেষ্ট হয়। তবে গ্রাম উন্নয়নের কোন কর্মসূচিই শহরকে বা জাতীয় কর্মসূচিকে বাদ দিয়ে সম্পন্ন করা হয় না। গ্রামীণ জনগণের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রাম ও শহরের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মানুষকে পরিবর্তনের মাধ্যমে শহরের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামীণ মানুষকে শহরের সাথে খাপ খাওয়াতে তেমন বেগ পেতে হয় না। গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্তরা শহর থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান গ্রামে নিয়ে আসে এবং গ্রামীণ চিরাচরিত (Traditional) দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে এবং এসকল পরিবর্তনের মূল অবদান হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

শিক্ষা গ্রামীণ জনগণের ও কৃষি খাতের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, গাজীপুরের গ্রামীণ এলাকায় "Education has significantly positive impact on non-agricultural income and total income" *(Haq et al., 2001. The role of farmer's education on income in Bangladesh, p. 32*).

অকৃষি আয়ের মূল উৎস হলো বেতন/মজুরী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। গ্রামীণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের তুলনায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের মাথাপিছু আয় বেশি এবং শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (দেখুন *BBS, 2011, Report of he household income expenditure survey 2010, Planning Commission, p. 96*)

গ্রামীণ পরিবেশে শিক্ষা শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতার কারণে শ্রমশক্তির গুণগতমান উন্নত হয় অর্থাৎ দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনকে লাভজনক করে তোলে। পুঁজি ও শ্রমের একক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে জ্ঞান/শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে (গ্রামে ও শহরে)। শিক্ষার সুযোগ গ্রাম এলাকায় মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক। গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে বহুলাংশে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অর্থাৎ সৃজনশীলতা, পুঁজি, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে গ্রামীণ পর্যায়ে একত্রিতভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতাকে বোঝায়। এছাড়াও শিক্ষা মানুষের জ্ঞানগত (Cognitive) উন্নয়ন, ব্যক্তির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, ব্যক্তির চাহিদা নির্ধারণ, মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ নির্ণয় ও নির্মূল/হ্রাসের পথ-পদ্ধতি নির্ণয়করণ, গ্রামীণ সমাজের বৈষম্যের কারণ নির্ণয় ও হ্রাসের পথ উদ্ভাবন এবং গ্রামীণ জনগণের নেতৃত্ব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭

ক. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. গ্রামীণ উন্নয়নের প্রথম এ্যাপ্রোচ হলো উৎপাদনমুখী এ্যাপ্রোচ।
২. বাংলাদেশের গ্রাম এলাকাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমশক্তি বসবাস করে।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামীণ মানুষকে শহরের সাথে খাপ খাওয়াতে বেশ বেগ পেতে হয়।

সঠিক উত্তরঃ ১। সত্য; ২। সত্য; ৩। মিথ্যা।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণাটি কী?
২. গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক খাতসমূহ কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রামীণ উন্নয়নের এ্যাপ্রোচগুলো বর্ণনা করুন।
২. গ্রামীণ উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৮ : শিক্ষা এবং কৃষি উৎপাদন/উন্নয়ন
Education and Agricultural Production/Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কৃষি উৎপাদনে শিক্ষার অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির শিক্ষাগত পরিসংখ্যান/তথ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষা অর্জনের সাথে কৃষি খাতে নিয়োজনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়নে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা ও কৃষি উৎপাদন: আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট

শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিউৎপাদনকে ত্বরান্বিত করা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমশক্তির শিক্ষাস্তরের সাথে উৎপাদনশীলতার সহ-সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে Griliches মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, "The education of farmers was an important determinant of agricultural productivity" (*Schultz T. P, 1998, Education Investments and Returns, in Hand Book of Development Economics, Vol-1, Edited by Chenery H., Srinivasan T. N., North Holland*)

১৯৮০ এবং ১৯৮২ সালে Lockhead M. E., Jamison D. T. এবং Lau J. স্বল্প আয় অর্জনকারী দেশের ১৮টি গবেষণার সংক্ষেপিত অংশ প্রকাশ করেছেন। এতে তাঁরা কৃষির উৎপাদনশীলতার উপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। গবেষকগণ কৃষি খামারের ৩৭ সেট পরিসংখ্যানিক তথ্য (Data) পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৭টির ভেতর ছয়টি সেটে "Education was found to have a negative (but statistically insignificant) effect, but in the remaining thirty one, the effect was positive and usually significant" (*Lockheed E. M; et al, 1980, Farmer education and Farm efficiency: A Survey, in World Bank Staff Working Paper No. 402, p. 120*)

১৯৬৭ সালে Yotopoulos P. A গ্রীসের ৪৩০টি কৃষি খামারের উপর একটি গবেষণা সম্পন্ন করেন। এতে তিনি দেখতে পান যে, এক বছর অতিরিক্ত শিক্ষা বৃদ্ধির ফলে কৃষি খামারের উৎপাদন ৬.৪৭% বৃদ্ধিপায়। এক বছর শিক্ষা বৃদ্ধির সাথে কৃষি খামারের উৎপাদন ৬০৬.৪০ দ্রাখমা (Drachma) (গ্রীসের মুদ্রা) বৃদ্ধি পায়। তবে সবগুলো গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "Farm Productivity increases, on the average, by 7.4 percent as a result of a farmer's completing four additional years of elementary education rather than none" (*Ibid, p. 136*). তবে ১৯৮২ সালে Jamison D. T. এবং Lau J. প্রাথমিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য কিছু শোধনকৃত (Refined) সিদ্ধান্তে উপনীত হন। Analyzing "their samples from Malaysia, Thailand, and South Korea they estimate a year of schooling is on average associated with a net increment to farm product of 5.1, 2.8 and 2.3 percent. Social returns to rural schooling are then

calculated for the 1970s under various working assumptions; the Social returns are between 25-40 percent, 14-25 percent and 7-11 percent in Malaysia, Thailand and South Korea respectively (*Schultz T. P., 1998, Education Investments and Returns, in Handbook of Development Economics, Hollis Chenery et. al, vol-1, p. 598*)

FAO এবং UNESCO যৌথভাবে ২০০০ সালে গণচীনের গ্রামীণ উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব নির্ণয়ের জন্য ১২টি প্রদেশ ও মিউনিসিপ্যালিটিতে কৃষকদের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করে এবং ২০০৩ সালে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, "মৌলিক শিক্ষা অর্জনকারীদের মাথাপিছু আয় ১৩০০ ইউয়ান, মধ্যম স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের মাথাপিছু আয় ২০০০ ইউয়ান, উচ্চ স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের মাথাপিছু আয় ১৭০০ ইউয়ান। মৌলিক শিক্ষা অর্জনকারীদের শ্রমিক প্রতি উৎপাদনশীলতা ২২৮২ ইউয়ান, মধ্যম স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ৩৫৭৭ ইউয়ান, উচ্চ স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ৩৫১৯ ইউয়ান। এসকল ফলাফল থেকে বলা যায় যে, মধ্যম স্তরের মূলত কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষাই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে" (*FAO, UNESCO (2003), Education for rural development: towards new policy responses, p. 280*) ।

কৃষকের উৎপাদনের উপর শিক্ষার প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য Welch F, ১৯৭০ সালে "উৎপাদনে শিক্ষা" নামক গবেষণা প্রবন্ধে শিক্ষার তিন ধরনের প্রভাবের নামোল্লেখ করেছেন। "প্রথমত: এক ঘণ্টা শ্রমশক্তিসহ পরিমাপকৃত ইনপুট (Input) সমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা অবদান রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন প্রযুক্তিগত তথ্য বোধগম্যকরণের মাধ্যমে শিক্ষা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে। ইনপুট এবং আউটপুটের (Output) নির্ধারিত মিশ্রণ পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এটাকে বণ্টন দক্ষতা প্রভাব বলা যায়। তৃতীয়ত: ইনপুট ও আউটপুট-এর মূল্য পরিবর্তিত হয়ে ভারসাম্যহীনতা (Disequilibria) সৃষ্টি হলে এবং নতুন কোন ইনপুট ও প্রযুক্তির প্রবর্তন হলে শিক্ষা দ্রুত শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রতিক্রিয়া (Response) সৃষ্টি করতে পারে (*Schultz T. P., 1998, Ibid, p. 598*)। এছাড়াও দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে অধিক শিক্ষিত কৃষকগণ খামারে (On-farm) এবং খামারের বাহিরে (Off-farm) দ্বৈত কাজে নিয়োজিত থাকে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষিতে নিয়োজিতদের আয়ের একটা অংশ কৃষি বহির্ভূত খাত থেকেও আসে। অধিকতর শিক্ষিতদের কৃষি বহির্ভূত খাত থেকে আয় বৃদ্ধিতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। কৃষি বহির্ভূত কোন খাতে শিক্ষার ফলে অধিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হলে শিক্ষিত কৃষকেরা কৃষি কাজ পরিত্যাগ করবে এবং কৃষিখাতে দ্রুত আয় বৃদ্ধি পেলে শিক্ষিতরা আবার কৃষিকাজে ফিরে আসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালে চীনের উপর গবেষণায় দেখা যায় যে, "মৌলিক শিক্ষা অর্জনকারীরা তাদের মোট আয়ের প্রায় ৬.৫% , মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীরা তাদের মোট আয়ের প্রায় ৩৩% এবং উচ্চ স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীরা তাদের মোট আয়ের প্রায় ২৫% শস্য উৎপাদন ও পশুপালন থেকে আয় করে। অন্যদিকে শিল্প থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারীদের আয় যথাক্রমে ২২%, ২৮% এবং ৫৯%" (*FAO, UNESCO, 2003, Education for rural development: towards new policy responses, p. 280*)

সুতরাং শিক্ষাস্তর যাদের কম তারাই সম্ভবত অন্যান্য বিকল্প খাতে অধিক আয় উৎপাদন সৃষ্টি করতে না পারায় কৃষি খাতেই নিজেদের অধিক শ্রমশক্তি ব্যয় করছেন এবং শিক্ষা ও অন্যান্য কারণে যারা কৃষি খাতের বাহিরে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাচ্ছেন তারা কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসছেন। দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির সাথে সংশ্লিষ্টরা যখন উন্নততর /উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে এতে তাদের পেশাগত গতিময়তা (Mobility) সৃষ্টি হয় এবং তাদের জীবনকালে কৃষি বহির্ভূত আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের কৃষিতে শিক্ষিত শ্রমশক্তির নিয়োজন প্রবণতা

কোন দেশের উন্নয়নে শিক্ষার একটা কেন্দ্রিয় ভূমিকা থাকে। শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। কোন দেশের শ্রমশক্তি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত হয়। তন্মধ্যে একটি খাত হলো কৃষি। কৃষিতে আবার বিভিন্ন উপখাত রয়েছে। ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের শ্রমশক্তির ৭১.৭৩% গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। বাংলাদেশে নিয়োজিত (Employed) মোট শ্রমশক্তির ৭২.১৮% গ্রামেই কর্মরত। গ্রামে কর্মরত শ্রমশক্তির ২৭.৪০% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। বাংলাদেশের "কৃষি খাতে নিয়োজিতদের ৩১.২৮% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, ৩৪.৭৪% এর প্রাথমিক শিক্ষা, ২৫.১০% এর মাধ্যমিক শিক্ষা, ৬.৮৮% এর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, ১.৫৪% এর উচ্চশিক্ষা এবং ০.৪৫% এর অন্যান্য শিক্ষা রয়েছে (*BBS, 2015, Labour Force Survey Bangladesh 2013, Ministry of Planning, p. 56*)। দেখা যাচ্ছে যে, একটা বড় সংখ্যক শিক্ষিত শ্রমশক্তি বাংলাদেশের কৃষি ও এর উপখাতসমূহে কর্মরত রয়েছে।

প্রশ্ন হলো শিক্ষা বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী শ্রমশক্তির পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করছে কি? এ সম্পর্কে বাংলাদেশের গ্রামে ১৯৮২ সালে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ পরবর্তী সিদ্ধান্ত হলো, "শিক্ষার মানের সাথে কৃষিখাতে শ্রমের যোগানের নেতিবাচক এবং অকৃষিখাতে শ্রমের যোগানের ইতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া যায়। ... একজন মাধ্যমিক স্কুল উত্তীর্ণ সদস্য একজন অশিক্ষিত সদস্যের তুলনায় গড়ে বছরে (৯৪-৫১) ৪৩ দিন কম কাজ করে" (*হোসেন মা., ২০০৩, গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌলিক শিক্ষার প্রভাব ও চাহিদা, অন্তর্ভুক্ত-বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, মাহবুব হোসেন ও রুশিদান ইসলাম রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ.* ২৭৬-২৭৭)। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৭ জেলায় ৬২টি গ্রামে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষকগণ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। "লেখাপড়া যত বেশি, কৃষি ছেড়ে যাবার প্রবণতা ততই তীব্র। উদাহরণস্বরূপ, যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাশ করেছে, সে সমস্ত শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত এবং শিক্ষার স্তর যত কমছে, কৃষিতে সম্পৃক্ততা ততই বাড়ছে" (*বায়েস অ., হোসেন মা., ২০০৭, গ্রামের মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি, স্বরাজ প্রকাশনী, পৃ.* ২৮)। এ পর্যবেক্ষণ মানব পুঁজি তত্ত্বের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষা, আধুনিক কৃষি ও উৎপাদনশীলতা

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে এখনো পর্যন্ত কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১০ সালের গৃহস্থালি আয়-ব্যয় জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় যে, "বাংলাদেশের জিডিপি-র ২০.৪৪% এবং গ্রামীণ জিডিপি-র ২৯.৭৩% কৃষি খাত থেকে আসে" (*BBS, 2011, Report of the Household Income and Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, p. 32*).

বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়ন ও উৎপাদনশীলতায় শিক্ষার অবদান সম্পর্কে আলোচনা মূলত শস্য খাত-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে (কারণ শস্য উৎপাদন কৃষির প্রধান খাত)। কোন দেশের কৃষিতে শিক্ষার অবদান সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই যে বিষয়টি দেখতে হবে তাহলো– কৃষি কাজ আধুনিক পদ্ধতি না সনাতন পদ্ধতিতে হচ্ছে। সনাতন পদ্ধতির কৃষি উৎপাদনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ বংশানুক্রমে এ পদ্ধতি অভিজ্ঞতার আলোকে হস্তান্তরিত হয়। এতে সনাতনী কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন সর্বোচ্চ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু এর বিপরীতে আধুনিক কৃষি উৎপাদনে অর্থাৎ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন ও উন্নত শস্যবীজ, আধুনিক উপকরণের উৎস, সময়ানুযায়ী সার, পানি ও শস্যের রোগবালাই দমনে পদক্ষেপ গ্রহণ, মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী শস্য বপন ও সার প্রয়োগ, উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ, বাজার বিশ্লেষণ, কৃষি ঋণের প্রয়োজনে ব্যাংক কর্মকর্তার

সাথে সংযোগ স্থাপন, সরকারি কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিক্ষার প্রভাব নিরূপণের জন্য কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল রয়েছে। নিম্নে সে সকল ফলাফল উত্থাপিত হলো।

১৯৮১ সালে সিলেটের ধান উৎপাদনকারীদের উপর রিচার্ড এইচ ফুলার গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, "The estimated mean gain in output, for all classes, associated with one year of schooling is 2.9%" (*Fuller R. H., 1985, Schooling, Social Class and Productivity: A Study of Rice Farmers in Northeastern Bangladesh, in "The Bangladesh Development Studies, Vol- XIII, No. 3 & 4, p. 104*). তবে ফুলারের গবেষণায় আরো যে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা হলো উঁচু শ্রেণির কৃষকেরা নিচু শ্রেণির কৃষকদের তুলনায় একই স্তরের শিক্ষা থেকে অধিকতর উৎপাদনশীল (Productive) সুবিধা পায়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) ১৯৮২ সালে ১৬টি গ্রামে একটি নমুনা জরিপ পরিচালনা করে। প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে জরিপটি পরিচালিত হলেও জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের গুরুত্ব আজো রয়েছে। জরিপের ফলাফলে কৃষি উৎপাদন "ব্যবস্থাপনার ওপর বর্তমান শিক্ষার (অর্থাৎ তৎকালীন শিক্ষার- লেখক) কোন ইতিবাচক ফলাফল দেখা যায় না। বরং অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতদের মাঝেই সেচ, সার ও মজুরের ব্যবহার বেশি" *(হোসেন মা (২০০৩), গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌলিক শিক্ষার প্রভাব ও চাহিদা, অন্তর্ভুক্ত– বাংলাদেশের কৃষি-গ্রামীণ উন্নয়ন, মাহবুব হোসেন, রুশিদান ইসলাম রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২৭৪)*।

উল্লিখিত মতামতের পরও গবেষক এটাকে শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নন। কারণ যারা কম শিক্ষিত তাদের খামারের আয়তনও ছোট এবং দারিদ্র্যের চাপের জন্য ছোট আকারের খামারে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। আবার কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে শিক্ষা ছাড়াও মাটির গুণাগুণ, সেচ, সার, বালাইনাশক, বর্গাচাষে জমির পরিমাণ, চাষকৃত জমির অনুপাতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, কৃষি ঋণ প্রাপ্তি প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, যাদের স্কুল শিক্ষা নেই, দু'বছরের স্কুল শিক্ষা রয়েছে, ৩ থেকে ৫ বছরের স্কুল শিক্ষা রয়েছে, ৬ থেকে ১০ বছরের স্কুল শিক্ষা রয়েছে তাদের তুলনায় দশ বছরের অধিক শিক্ষাগ্রহণকারীরা (নমুনার ২.০৩%) প্রায় ৩০%, ২১%, ৩০% এবং ১৪% সার কম প্রয়োগ করে স্থানীয় জাতের ধানের ফলন যথাক্রমে প্রায় একর প্রতি ৬%, ৮%, ৯%, ১৫% এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের ফলন ২৬%, ২৬.৩%, ২৬% ও ২৭% বৃদ্ধি করেছে (সারণি- ১২)। আরো একটি বিষয় হলো যে, যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের তুলনায় প্রায় একর প্রতি ৭% শ্রমশক্তি কম ব্যবহার করে দশ বছরের অধিক শিক্ষা গ্রহণকারীরা একর প্রতি উপরোল্লিখিত ফলন পেয়েছে। এছাড়া অন্যদের তুলনায় দশ বছরের অধিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের একর প্রতি শ্রমশক্তি ব্যবহারের হার কিছুটা বেশি।

সারণি– ১২: কৃষি উৎপাদন ও পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা স্তরের সম্পর্ক

নির্দেশক	লেখাপড়া জানে না	দু'বছর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত	৩-৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত	৬-১০ বছর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত	১০ বছরের অধিক পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত
জমির পরিমাণ (একরে)	১.৩৩	২.৪৪	৩.০০	৩.৩৭	৪.৪৬
জমি ছাড়া অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ (টাকা)	২৯৯২	২৭৪৬	৩৩২২	৪৯৭৯	৪২৭৬
সেচের আওতায় জমির শতকরা হার	২১.৮	৩৪.৪	২৬.০	৩৮.৯	৩২.৫
উচ্চ ফলনশীল ধানচাষে জমির শতকরা হার	৪৯.৭	৪৮.২	৪৪.৮	৩৩.৪	৩৩.৫
একর প্রতি রাসায়নিক সার ব্যবহার (পাউন্ড)	১৪৫	১২৯	১৪৫	১১৯	১০২
একর প্রতি শ্রমের ব্যবহার (শ্রম দিন)	৫৫	৫১	৫১	৪৫	৫৩
একর প্রতি স্থানীয় ধানের ফলন (মণে)	২৬.৩	২৫.৯	২৫.৫	২৪.৩	২৭.৯
আধুনিক ধান চাষে একর প্রতি ফলন (মণে)	৩৬.৬	৩৬.৫	৩৬.৬	৩৬.৩	৪৬.১

উৎস: হোসেন মা (২০০৩), গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌলিক শিক্ষার প্রভাব ও চাহিদা, অন্তর্ভুক্ত–বাংলাদেশের কৃষি-গ্রামীণ উন্নয়ন, মাহবুব হোসেন, রুশিদান ইসলাম রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২৭৪)

কাজেই একর প্রতি তুলনামূলকভাবে কম শ্রমশক্তি (যারা লেখপড়া জানে না তাদের তুলনায়) এবং সার ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনকে শিক্ষার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির সহ সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে ২ থেকে ১০ বছর শিক্ষা অর্জনকারীদের একর প্রতি উৎপাদন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের তুলনায় বেশি না হওয়ার কারণ হলো, ''লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন স্কুলের পাঠ্যসূচিতে তার অনুপস্থিতি এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে গলদের জন্য" (*প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৭৫) হয়তো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না।

শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির সহ-সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, "The rice production increases with the increases in the level of education of farmer. This result suggests that the level of education of farmer has positive effect on rice production" (*Islam S. M. et. al; 2013, Impact of Education on Rice Production in Northern Districts of Bangladesh: A Ridge Regression Analysis, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 29, No. 1, Bangladesh Economic Association, p. 205*).

"কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে হলে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন" (*হোসেন মা.*, ২০০৩, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ২৭৫)। এছাড়া স্বল্প শিক্ষিতদের কৃষি খামারের আয়তন সাধারণভাবে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) ছোট থাকে। গবেষণায় দেখা যায় যে, "The higher the education of the farmers, the higher was their farm size, income ... The more the agricultural knowledge of the farmers the higher was their income and contact with information sources, and lower was their risk aversion, fatalism, and perceived factor obstacles" (*Kasem M. A., 1987, Small farmers' constraints to the adoption of modern rice technology; The Bangladesh Development Studies, vol. XV, No. 4, pp. 124-127*)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮

ক. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১. অধিক শিক্ষিত কৃষকগণ ..... এবং খামারের বাহিরে দ্বৈত কাজে নিয়োজিত থাকে।
২. শিক্ষার মানের সাথে কৃষি খাতে শ্রমের যোগানের ..... সম্পর্ক পাওয়া যায়।
৩. সনাতন পদ্ধতির কৃষি উৎপাদনে ..... শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

সঠিক উত্তরঃ ১। খামারে; ২। নেতিবাচক; ৩। প্রাতিষ্ঠানিক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. Yotopoulos-এর গবেষণার সিদ্ধান্ত কী?
২. গণচীনের গ্রামীণ উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাবগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পাদিত গবেষণার আলোকে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাবসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.৯: শিক্ষা এবং নারীদের উন্নয়ন/ক্ষমতায়ন
Education and Women's Development/Empowerment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষমতায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সাংবিধানিকভাবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়নের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে, নিয়োজনে, আয় প্রবাহে শিক্ষার উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের বহুমুখী ক্ষমতায়নের ছক বিবৃত করতে পারবেন।

"বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানব মাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না" (*স্ত্রী শিক্ষা, রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা- শোয়াইব জিবরান, সংবেদ, ২০১২, পৃ. ৬৯*)।

" ... সমাজে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারো বক্তৃতায় নয়, কর্তব্য জ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে"। (*য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি, রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনা সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা- শোয়াইব জিবরান, সংবেদ, ২০১২, পৃ. ৩২৩*)

ক্ষমতায়নের ধারণা/ক্ষমতায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীগণ ক্ষমতায়নকে বিভিন্নভাবে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ক্ষমতা বলতে মানুষের আর্থিক, মানবিক, বস্তুগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণকে বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে ক্ষমতায়ন বলতে ক্ষমতার সাথে সমাজের ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, গোত্র প্রভৃতির সম্পর্ককে বোঝানো হয়ে থাকে। Nelly Stromquist-এর মতে, ক্ষমতায়ন হলো, "A process of change the distribution of power both in interpersonal relations and in institutions throughout society" (*Carolyn Medel-Anonuevo and Bettina Bochynsk, UIE Studies 5, 1995, Women, Education and Empowerment, Germany, p. 8*)

আবার Paz এর মতে ক্ষমতায়ন হলো, "The ability to direct and control one's own life" (*Ibid, p. 8*) কেউ কেউ ক্ষমতায়নের চারটি উপাদান রয়েছে বলে মনে করেন। উপাদানগুলো হলো– জ্ঞানগত, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের অবস্থা জানার এবং নারীদের অধীনতা (Subordination), অধীনতার কারণসমূহ সম্পর্কে জানা জ্ঞানগত উপাদানেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে লিঙ্গ সম্পর্কের (Gender relation) বিভিন্নমুখী নতুন ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং একইভাবে লিঙ্গ-সম্পর্কের পুরানো ধারণা ও আদর্শকে ধ্বংস ও বর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মনস্তাত্ত্বিক উপাদান নারীদের মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে, নিজেরা চেষ্টা করলে নারীরা তাদের অবস্থার পরিবর্তন এবং উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক উপাদান হলো যে, নারীরা উৎপাদনশীল কাজকর্মে যুক্ত হলে তা তাদের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন (Autonomy) পেতে সহায়ক হবে। তবে শুরুতে স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা কম হলেও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

আয় সৃষ্টিকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা কিছুটা কঠিন কারণ এটা যেমন সময় সাপেক্ষ (Time-consuming), ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রথম দিকে অদক্ষতা থাকে। তবে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এবং বাজারজাতকরণ,

হিসাবরক্ষণ এবং পর্যাপ্ত তহবিল পেলে নারীরা উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়। এভাবে নারীরা আয়বর্ধক কাজকর্মকে বাণিজ্যিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে পারে। রাজনৈতিক উপাদানে থাকবে নারীদের পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত ও সমবেত করার প্রক্রিয়া। এতে শুধু ব্যক্তিগত সচেতনতার উপর নির্ভর করলেই চলবে না, বরং প্রয়োজন হবে যৌথ সচেতনতা ও যৌথ সক্রিয়তার। সামাজিক রূপান্তরের জন্য যৌথ সক্রিয়তার (Collective action) বিকল্প নেই বলা যায়। যৌথভাবে কণ্ঠস্বর (Voice) এবং যৌথ শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হলে নারী ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ক্ষমতায়িত হবে এবং তুলনামূলকভাবে নারীরা অধিকতর শক্তি ও সাহস পাবে যা তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দর কষাকষির শক্তি যোগাবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ও নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BANBEIS, ব্যানবেইস) তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ১৬২৫১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০৬৪৭০৩ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন এবং তন্মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৪৩১৩১৬ জন বা ৪০.৫১% নারী। এ সময়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৬৮০২১৮৭ এবং তন্মধ্যে ১৮৪৪৮৪৫২ বা ৫০.১৩% নারী। তবে বিভিন্ন স্তর ভিত্তিক নারীদের শিক্ষা গ্রহণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে "প্রাথমিক শিক্ষায় ৫১%, মাধ্যমিক শিক্ষায় ৫০.৩৬%, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় ৪৬%, মাদ্রাসা শিক্ষায় ৫৪%, পেশাগত শিক্ষায় ৩৯%, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় ৩৩%, শিক্ষক শিক্ষায় ৩৪% নারী শিক্ষার্থী ছিল" (*BANBEIS, 2016, Bangladesh Education Statistics 2015, Ministry of Education, pp. 25-26*)। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের (নবম-দশম) বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তির (Enrolment) ক্ষেত্রে নারীদের সমতা অর্জিত হয়েছে। তবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হার বেশ কমে আসলেও এখনো ''প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ছে ২০.৯% শিক্ষার্থী এবং এদের মাঝে দরিদ্র নারী শিক্ষার্থীদের হার বেশি" (*GED, 2015, 7th Five Year Plan- FY2016-FY2020, Planning Commission, p. 533*)।

২০১৫ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "মাধ্যমিক স্তরে ৩৩.৭২% পুরুষ ও ৪৫.৯২% নারী শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে এবং পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীদের সফলভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার যথাক্রমে ৬৬.২৮% ও ৫৪.০৮% (*BANBEIS, 2016, p. 35*)। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য "মাধ্যমিকোত্তর থেকে উচ্চ শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা সূচক (Gender Parity Index) ০.২৪ থেকে ০.৬৭ (স্নাতক)" (Ibid, p. 39) হলেও দরিদ্র নারী শিক্ষার্থীদের অবস্থা আরো মন্দ বলে ধারণা করা যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। তন্মধ্যে অনুচ্ছেদ ১৯-এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তাহলো "সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ; মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপকরণ ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (*আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৬*)। এছাড়া সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন" (*প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৮(২), পৃ. ৮*) স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারী সমাজ (বিশেষত দরিদ্র নারীরা) শিক্ষার ক্ষেত্রে অসম অবস্থায় রয়েছে এবং এই অসমতার ফলেই নারীদের ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা হচ্ছে নারীদের সামাজিক, জ্ঞানগত, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভবত: সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। নারীদের মাঝে শিক্ষা নতুন চিন্তা-চেতনা, ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে তাদের ক্ষমতায়নের পথকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করে। সম্ভবত এ কারণেই অমর্ত্য সেন মনে করেন, "Women's education strengthens women's agency and also tends to make

it more informed and skilled" (*Sen A., 2000, Development As Freedom, Oxford, p. 192*) অমর্ত্য সেন এজেন্সি বলতে নারীদের Autonomy অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনকে বুঝিয়েছেন। এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে নারীদের আয়, পরিবারের বাইরে অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম, সাক্ষরতা এবং শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি প্রথমেই নজরে আসে।

নারী শিক্ষা ও দারিদ্র্য

শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনমানের গুণগত পরিবর্তন সাধন করা। শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে এবং মানব দারিদ্র্য প্রশমনে ধনাত্মক অবদান রাখে। নারীদের শিক্ষা সাধারণত তাদের আয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং এর ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হয়। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা নারীদের দারিদ্র্য দূর করে। বাংলাদেশের গৃহস্থালি আয়-ব্যয় জরিপ-২০১০ এর তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব পরিবারের/গৃহস্থালির প্রধান নারী, পুরুষ প্রধান পরিবারের তুলনায় কম শতাংশ হারে সেসব পরিবারে দারিদ্র্য বিদ্যমান রয়েছে। সারণি-১৩ তে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, যারা কখনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের মাঝে দারিদ্র্যের হার সর্বাধিক। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাচ্ছে। নারী প্রধান পরিবারের যারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি সেসব পরিবারে দারিদ্র্যের হার ৩৫.২% এবং এসএসসি ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা গ্রহণকারীদের দারিদ্র্যের হার ১.৯%। অর্থাৎ নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করছে।

সারণি-১৩: গৃহস্থালি প্রধানের শিক্ষার স্তর অনুযায়ী দারিদ্র্য পরিস্থিতি-২০১০

শিক্ষাস্তর	দারিদ্র্য পরিস্থিতি (Incidence)		
	নারী পরিবার প্রধান	পুরুষ পরিবার প্রধান	মোট
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	৩৫.২	৪৩.৯	৪২.৮
প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি	১৮.৪	৩৭.২	৩৫.৭
ষষ্ঠ–নবম শ্রেণি	১৩.৮	২৩.৬	২২.৬
এসএসসি/এইচএসসি বা সমমান	১.৯	৭.৮	৭.৫
মোট=	২৬.৭	৩২.১	৩১.৫

Source: BBS (2013), Gender Statistics of Bangladesh 2012, p. 108, Quoted from HIES, BBS (2010), Ministry of Planning

শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত নারী শ্রমশক্তি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজন

বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী শ্রমশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের মোট নারী শ্রমশক্তি ছিল ২০০৬১ হাজার এবং তন্মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী শ্রমশক্তি ছিল ৮২০৯ হাজার (৪০.৯২%)। উক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমশক্তির ৩০২৯ হাজার বা ৩৬.৯০% কর্মরত ছিল (*BBS, 2002, Report of the Labour Force Suvey Bangladesh 1999, pp. 33, 118*)। ২০১৩ সালের বাংলাদেশের শ্রমশক্তি জরিপ রিপোর্ট ২০১৫ প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায় ১৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের "কর্মক্ষম নারী শ্রমশক্তি ছিল ৫৪২০৯ হাজার এবং তন্মধ্যে ১৬৮৪৬ হাজার বা ৩১.০৮% বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত ছিল। এই নিয়োজন প্রাপ্ত নারী শ্রমশক্তির ৭৮.৬৪% এর বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ছিল" (*BBS, 2015, Labour Force Suvey 2013, Ministry of Planning, pp. 144, 55*)।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের ৪৭৭৩৭ হাজার নারীর মধ্যে মাত্র ১২১৫ হাজার বা ২.৫৫% নারী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এসকল নারীরা মূলত কারিগরি/বৃত্তিমূলক, খাদ্য সরবরাহজনিত সেবা, দর্জি/গার্মেন্ট-এর কাজ, বিদেশী ভাষা, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, সেবিকা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। একমাত্র সেবিকা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল (*BBS, 2011, Report on Labour Force Suvey 2010, p. 99*)।

অন্যদিকে ২০১৩ সালের শ্রমশক্তির জরিপ রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের ৩২.০% কম্পিউটারে, ১৬.৭% তৈরি পোশাক শিল্পে, ১৩.১% কারিগরি/হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পে, ৮.০% স্বাস্থ্য ও প্যারামেডিকেল সেবায়, ৬.৮% পোল্ট্রি শিল্পে, ৫.৭% অফিস ব্যবস্থাপনায়, ৪.৫% বিউটিশিয়ান ও কেশ বিন্যাসে, ৩.৩% কৃষি শস্য উৎপাদনে, ২.৯% গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এবং বাকিরা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন (*BBS, 2015, Labour Force Suvey Bangladesh 2013, pp. 38-39*)। তবে ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এ সময়ে "বাংলাদেশে ৫৭৪৪৭৫৫ জন ১৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের শ্রমশক্তি ভোকেশন্যাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও নারীদের সংখ্যা হলো ১৬৪২৫৬৬ বা ২৮.৫৯%" (*Ibid, p. 38*)। দেখা যাচ্ছে যে, নারী শ্রমশক্তি শ্রমবাজারের দক্ষতা অর্জনকারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে।

নারী শ্রমশক্তির শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বিগত বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। "২০০২-২০০৩ সালে ২৬.১% নারী শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করলেও ২০১৩ সালে ৩৩.৫% নারী শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করেছে" (*Ibid, pp. 46-47*)।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে কতকগুলো সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে:

প্রথমত: পুরুষ শ্রমশক্তির তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের নারী শ্রমশক্তি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে পূর্বের তুলনায় উন্নয়ন সাধন করেছে।

দ্বিতীয়ত: নারী শ্রমশক্তির শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয়ত: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কারণে নারীদের চলাচল (Mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মস্থলে নারীদের সামাজিকীকরণ হয়, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্লেষণ ও যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে, কর্মক্ষেত্রে বা অন্যান্য স্থানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে, নিজের দারিদ্র্য বা বঞ্চনার কারণসমূহ বুঝতে সক্ষম হয়, নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ অনুধাবন ও প্রতিবাদে সক্রিয় হয়, বিভিন্ন তথ্য গ্রহণে সক্ষম হয়, পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনে এবং সন্তানের শিক্ষা বা চিকিৎসায় নারীর মতামত গুরুত্ব পায়। অমর্ত্য সেনের মতে, "Involvement in gainful employment has many positive effects on a woman's agency roles, which often include greater emphasis being placed on child care and greater ability to attach more priority to child care in joint family decisions" (*Sen A., 2000, Development as freedom, Oxford, p. 196*).

শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না বাড়ার পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে, "প্রথমত: অসম পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দ্বিতীয়ত: দক্ষ মানব সম্পদের অভাব, তৃতীয়ত: নানা ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বৈষম্য। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়িয়ে আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি-তে ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে" (*বিশ্বব্যাংক, প্রথম আলো, ১৫ মে, সোমবার, ২০১৭*)।

শিক্ষিত নারী- আয় প্রবাহ ও ক্ষমতায়ন

জাতীয়ভাবে নারীদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক ইতোমধ্যে উপস্থাপন (সারণি-৮) করা হয়েছে। ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, "বাংলাদেশের ৩০% নারী শ্রমশক্তির কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। ২৯.১% নারী শ্রমশক্তি মাত্র প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেছে, ৩৭.৭% নারী শ্রমশক্তি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের শিক্ষা অর্জন করেছে। মাত্র ৩.২% নারী শ্রমশক্তি উচ্চ শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অর্জন করেছে" (*BBS, 2015, Labour Force Survey Bangladesh 2013, p. 36*)। ধারণা করা যেতে পারে যে, কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত যাদের স্কুল শিক্ষা নেই, যাদের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি ও ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এইচএসসি বা সমানের শিক্ষা রয়েছে তাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য পীড়িত। এসকল স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী নারীরা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখলেও অনেকেই দারিদ্র্য থেকে বের হতে পারে না। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় কর্মরত পুরুষ ও নারীদের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী দৈনিক মজুরি সারণি-১৪ তে উপস্থাপন করা হলো। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একই স্তরের শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও নারীদের কম মজুরি দেয়া হচ্ছে। যদিও কারো কারো মতে, Education, Particularly at secondary and higher levels, has served to increase women's labour force participation rates and to reduce the gender gap in wages (*World Bank, 2008, cited in Kabeer et. at; 2011, Does Paid Work Provide a Pathway to Women's empowerment? Empirical findings from Bangladesh, IDS Working Paper, vol. 2011, No. 375, p. 9*).

সারণি- ১৪: নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের অঞ্চল ও শিক্ষাস্তর ভেদে দৈনিক মজুরী (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৯-২০১০)

শিক্ষাস্তর	শহর এলাকা (টাকায়)			গ্রামীণ এলাকা (টাকায়)		
	পুরুষ	নারী	নারী/পুরুষ	পুরুষ	নারী	নারী/পুরুষ
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১৫৭.৬২	৮৭.৫৩	৫৫.৫৩	১১৬.২২	৫৮.৭০	৫০.৫১
প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি	১৬৪.৬০	৮৭.৫৩	৫৩.১৮	১৩৫.৭১	৬২.৬৪	৪৬.১৬
ষষ্ঠ–নবম শ্রেণি	১০৭.১১	১০২.০০	৯৫.২৩	১৩৮.৪১	৯৪.৪৭	৬৮.২৫
এসএসসি এবং এইচএসসি	২০৫.৭৬	২৫০.০০	১২১.৫০	১৫৪.০২	৫৭.০০	৩৭.০১
স্নাতক ও তদুর্ধ্ব	১৯১.৭১	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	১৮৩.৬৭	১৯২.০০	১০৪.৫৪
প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক	২০০.০০	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	১৫০.০০	-
অন্যান্য	১৬৮.২৬	১১২.৭৫	৬৭.০১	১৭২.৩১	১৯৫.৫০	১১৩.৪৬

উৎস: সংগৃহীত ও হিসাবকৃত, বিবিএস (জুন-২০১১), বাংলাদেশে কর্মরত দরিদ্র্যদের মজুরী হার ২০০৯-২০১০, পৃ. ১৭

দেখা যায় যে, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম এলাকায় শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে নারীদের মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে নারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সাথে মজুরি/ বেতন বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেলেও এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীরা একদিকে যেমন তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আবার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতেও কর্মরত থাকে। গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীরা উন্নততর জীবনমান রক্ষার জন্য নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ নিজেরাই গ্রহণ করেন কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা সক্রিয় নন (Inactive) নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত তাদের অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়" (*Ibid, p. 21*)। বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিকভাবে যারা সক্রিয় নন তাদের পর্দা প্রথার (Purdah) অজুহাতে অথবা প্রকাশ্যে জনসাধারণের মাঝে না যাওয়ার জন্যই প্ররোচিত করা হয়। ফলে অনেক সময় অসুস্থতা নিয়েই তাদের জীবনযাপন করতে হয়। কাজেই যেসব শিক্ষিত নারী সরকারি, বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে বেতন/মজুরির

ভিত্তিতে কর্মরত থাকেন তাদের ক্ষমতায়ন হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা মজুরি/বেতনের বিনিময়ে কাজে সক্রিয় হলে নিজেদের অর্জিত বেতন/মজুরির অর্থের সাহায্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও/বীমা কোম্পানীতে সঞ্চয় করতে পারেন। ভূমি ক্রয় করতে বা বাড়ি নির্মাণ করতে পারেন- যা তাদেরকে ক্ষমতায়িত/ক্ষমতায়ন করে।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, "Women's secondary education is strongly associated with greater freedom of movement in relation to health centres and markets" (*Ibid, p. 26*)

আবার নিজস্ব আয়ের কারণে নারীরা মানসিকভাবে শক্তি অর্জন করে, নির্ভরশীলতামুক্ত হয়, সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে পারে, সমাজে সম্মান অর্জন করতে পারে।

ছক-৪: শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের একটি ছক কিছুটা পরিবর্তনসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

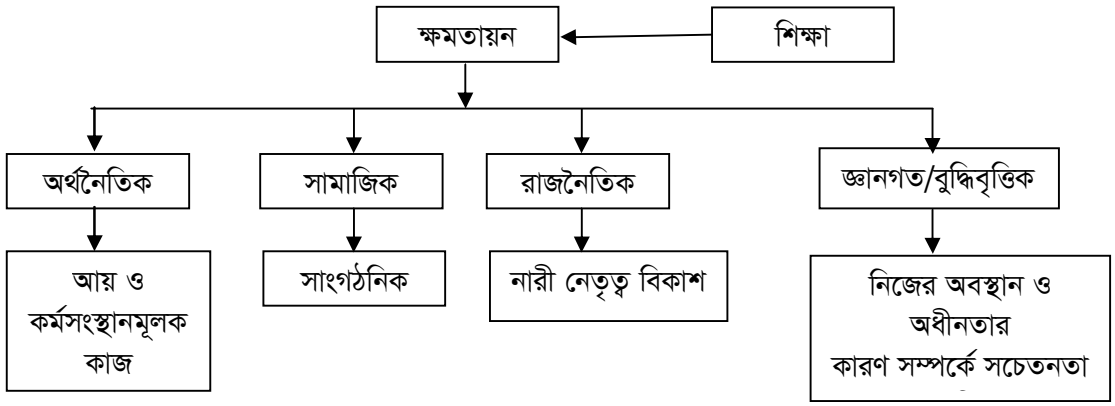

উৎস: কিছুটা পরিবর্তনসহ সাহা, ত (২০০৩), নারীর ক্ষমতায়ন: ধারণাগত কাঠামো ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, পৃ. ১৫০

শিক্ষা অর্জনের ফলে নারীরা রাজনৈতিকভাবেও সচেতন হয়, ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষিত নারীরাই এসব সংসদীয় আসনে মনোনীত হন। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটিতে এক তৃতীয়াংশ আসন (নির্বাচনের মাধ্যমে) সংরক্ষিত রয়েছে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের বিগত নির্বাচনে ১২০০০ এর অধিক নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেত্রী, সংসদের ডেপুটি নেতা এবং কয়েকজন নারী মন্ত্রীসভার সদস্য রয়েছেন। এছাড়া শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রভৃতিতে নারীদের অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়িত করেছে। বাংলাদেশের নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন। "উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক অভাব নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে ... ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশেরই শিক্ষা অতি নিম্ন" (*মজুমদার প্রতিমা পা, ২০১৪, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৫৮*) সুতরাং স্বল্প শিক্ষিত নারীরা নির্বাচিত হলেও ইউনিয়নের নারীদের স্বার্থ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে না। তাই উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা নির্বাচিত হলেই নারীদের নানা ধরনের অধিকার সংরক্ষণে এবং ক্ষমতায়নে সফলতা আসতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

খ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এ নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে?
   ক. একটি
   খ. তিনটি
   গ. দুইটি
   ঘ. চারটি

২. বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষার কোন স্তরে বেশি পিছিয়ে রয়েছে?
   ক. প্রাথমিক
   খ. মাধ্যমিক
   গ. উচ্চ মাধ্যমিক
   ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কী?
২. শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হওয়ার কারণ কী?
৩. কিভাবে নারীদের অধিকার সংরক্ষণে সফলতা আসতে পারে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের ক্ষমতায়নের অনেকগুলো অনুচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও কেন নারীরা ক্ষমতায়িত হতে বিলম্ব হচ্ছে– ব্যাখ্যা করুন।
২. নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, আয় প্রবাহ এবং মজুরি নির্ধারণে শিক্ষার উপযোগিতা বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের ছকটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.১০: শিক্ষা এবং পুনরুৎপাদনশীল আচরণের পরিবর্তন
Education and Changes of Reproductive Behaviour

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং শিক্ষার সাথে মানুষের পুনরুৎপাদনশীল আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাস্তরের সাথে নারীদের মোট প্রজনন হার, গর্ভধারণ, মাতৃত্ব অর্জন, গড় আদর্শ সংখ্যক সন্তান ধারণ প্রভৃতির সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- শিক্ষাস্তরভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, আধুনিক জন্মশাসন পদ্ধতি ব্যবহার, গণমাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বর্ণনা করতে এবং পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন এবং
- সন্তান গ্রহণ, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী শিক্ষার প্রভাব বিবৃত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উন্নয়ন অর্থনীতির বিশেষজ্ঞগণ অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, "২০১৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬১ মিলিয়ন এবং নারীদের মাঝারি প্রজনন হারকে (2.1-1.9 births per woman) বিবেচনায় নিয়ে প্রক্ষেপণে (Projection) দেখা যায় যে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৮৬.৫ মিলিয়নে। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে প্রতিজন নারীর গড় প্রজনন হার ছিল ২.৯ জন সন্তান এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ সালে নারীদের গড় প্রজনন হার দাঁড়িয়েছে ২.২ জন সন্তানে (*UNDP, 2016, Human Development Report 2016, p. 226*)।

বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬–২০২০) তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, ''১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫% যা ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.২০% এ। ... ১৯৭০ এর দশকে নারী প্রতি মোট প্রজনন হার (Total fertility rate) ছিল ৬.৩ জন ... বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ২.২১ জনে" (*GED, 2015, 7th Five Year Plan, FY 2016 – 2020, p. 505*)। উল্লেখিত পরিকল্পনা দলিলের ভাষ্যমতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের তিনটি বিভাগের প্রজনন স্তর প্রতিস্থাপন স্তরে পৌঁছেছে। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি বিস্তারের হার (Contraceptive Prevalence rate or CPR) প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে ৫৬% নারী গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করতো এবং ২০১৪ সালে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারকারী নারীদের হার হয়েছে ৬২%। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জন্মনিরোধক পদ্ধতি যেমন স্টেরলাইজেশন (Sterilization) বা বন্ধ্যাকরণ গ্রহণ করেছে বিবাহিত দম্পতিদের মাত্র ৮%। দেখা যায় গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের এক তৃতীয়াংশ এক বছর পর পদ্ধতিটি ব্যবহারে বিরত থাকেন।

অন্যদিকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বিয়ের আইনগত (Legal) বয়স ১৮ বছর হওয়া সত্ত্বেও ২০–২৪ বছর বয়স গ্রুপের নারীদের ৬৫% আঠার বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান নারীদের জন্য মৃত্যু সমতুল্য বলা যায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তথ্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, অল্পবয়সী মেয়েদের (Teenage girl) ২৫% সন্তান জন্মদান করে। শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিশু/বাল্য

বিয়ে এবং অল্প বয়সে সন্তান ধারণ রোধ করা কষ্টকর হচ্ছে বলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের প্রজনন হার (Fertility) বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হতে পারে। প্রজনন হারকে প্রভাবিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের প্রজনন হারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

"... greater female literacy and education is recognized across the world as a powerful contributor to women's empowerment, ..." (*Dreze J. & Sen A., 2013, An Uncertain Glory-India and its contradictions, Penguine Books, London, p. 59*)

Avevi "... female literacy and women's participation in the workforce play an important role in the 'demographic transition' (from high to low mortality and fertility rates) is fairly well established" (*quoted in Ibid, p. 61*)

"... Schooling of young women can substantially enhance the voice and power of women in family decisions. ... Women's empowerment tends to have a strong downward impact on the fertility rate. This is not surprising, Since the lives that are most affected by the frequent bearing and rearing of children are those of young women, and anything that enhances their voice and increases the attention that their interests receive tends, in general, to prevent over-frequent childbearing'' (*Ibid, p. 109*)

অন্যদিকে Literacy বা Basic education বলতে বোঝানো হয়েছে, "... The Capability to read and write and count ..."(*Ibid, p. 107*)। মৌলিক শিক্ষা মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস করে যে প্রভাব সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণ হলো, "Reduction of mortality rates, in turn, can help to reduce birth rates, reinforcing the influence of basic education – especially female literacy and schooling- on fertility behaviour" (*Sen, A., 1999, Development As Freedom, Oxford University Press, New Delhi- 110001, pp. 40-41*)

শিক্ষার সাথে মানুষের পুনরুৎপাদনশীল আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশের পুরুষ ও নারী গৃহস্থালির (Household) জনগণের শিক্ষা অর্জন সম্পর্কে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "ছয় ও তদুর্ধ্ব বছর বয়সের ২২.৯% পুরুষ ও ২৬.৭% নারী গৃহস্থালির কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। ২৮.৭% পুরুষ এবং ২৭.০% নারী গৃহস্থালি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেনি। ৪.৮% এবং ১১.৮% পুরুষ গৃহস্থালি যথাক্রমে মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষা অর্জন করেছেন। নারীদের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগুলো যথাক্রমে ৪.০% এবং ৭.৭%। ২০০৭ সাল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীদের সংখ্যা শতকরা হারে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং একই সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারী নারীদের সংখ্যা শতকরা হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাসত্ত্বেও ১৫-৪৯ বছর বয়সের বিবাহিত নারীদের ২৫% এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই" (*NIPORT, 2016, Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2014, pp. 22-23, 29*)।

গণমাধ্যমে শিক্ষা, জনসংখ্যা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের কারণে নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি, অধিক সন্তান জন্মদানজনিত সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আলোকপাত করা হয়। বাংলাদেশের নারীদের (১৫-৪৯ বছর বয়স গ্রুপের) "মাত্র ৫.৯% সপ্তাহে কমপক্ষে একবার খবরের কাগজ পড়েন, ৫০.৯% সপ্তাহে কমপক্ষে একবার টেলিভিশন দেখেন, ২.৭% কমপক্ষে সপ্তাহে একবার বেতারের পরিবেশনা শুনেন। মাত্র ০.৪% নারীর উল্লিখিত তিনটি গণমাধ্যমে প্রবেশ করার সুযোগ রয়েছে। তবে শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে গণমাধ্যমে প্রবেশের হার বৃদ্ধির সহসম্পর্ক রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা যারা শেষ করেননি এমন নারীদের মধ্যে ৬১.৫% সপ্তাহে

অন্তত একবার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীদের ৩০.২% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের ৮০.০% সপ্তাহে অন্তত একবার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখেন" (*Ibid, p. 33*)। ধারণা করা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী নারীরা পুনরুৎপাদনশীল আচরণগুলো অধিকহারে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে জানার ও নিজেদের জীবনে অধিক হারে প্রয়োগের সুযোগ পান।

মানুষের প্রজনন হার (Fertility) হ্রাসের উপর নানা ধরনের কারণ থাকলেও দেখা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নারীদের বিয়ের বয়সের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিয়ের ফলশ্রুতিতে নারীদের গর্ভবর্তী (Pregnant) হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের সমাজে বিয়ের মাধ্যমে নারীদের সন্তান ধারণ (Child bearing) সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করে। যেসব নারীরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সে বিয়ে করেন তাদের প্রথম সন্তান ধারণ কম বয়সে হওয়ার যেমন সম্ভাবনা থাকে একইভাবে অধিক সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে যা উচ্চতর প্রজনন হারের (Higher fertility) সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের নারীদের বিয়ের আইনসম্মত বয়স ১৮ বছর। "২০১৪ সালে ২০-৪৯ বছর বয়স গ্রুপের নারীদের বিয়ের মধ্যক বয়স (Median age) ছিল ১৬.১ বছর। অর্থাৎ আইনসম্মত বয়সের পূর্বেই অনেক নারী বিয়ে করেন। যারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি তাদের বিয়ের মধ্যক বয়স ১৫ বছর, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের বিয়ের মধ্যক বয়স ১৫.৭ বছর এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপনকারীদের বিয়ের মধ্যক বয়স ১৯.৯ বছর" (*Ibid, p. 42*)। দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে নারীদের আইনসম্মত এবং অধিক বয়সে বিয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন বাল্যবিবাহ হ্রাস পাচ্ছে আবার অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে অধিক বয়সে নারীরা সন্তান ধারণ ও প্রসব করছেন। ফলশ্রুতিতে প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে যা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, শিক্ষা গ্রহণকারীদের মাঝে পুনরুৎপাদনশীল আচরণের ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীরা অল্পবয়সে বিয়ে করছেন এবং অল্প বয়সে সহবাস করছেন। জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, "২৫-৪৯ বছর বয়স গ্রুপের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীদের সহবাসের মধ্যক বয়স ১৫ বছর, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী নারীদের ১৫.৬ বছর এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপনকারী নারীদের সহবাসের মধ্যক বয়স ১৯.৭ বছর " (*Ibid, p. 44*)।

নারীদের স্বামীরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের কাজের প্রয়োজনে দেশের কোন স্থানে বা বিদেশে গমন করেন। এ ধরনের অভিপ্রয়ানের (Migration) কারণে সাধারণত জন্মহার হ্রাস পায়। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা কম বা বেশি হওয়ার সাথে প্রজনন হার (Fertility) বৃদ্ধি ও হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। যেসব এলাকায় আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে সেসব এলাকায় স্বামীদের দূরে (দেশে বা বিদেশে) অবস্থানের ফলে প্রজনন হার হ্রাস পায়। নিপোর্ট (NIPORT)-এর জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, "৫.৯% প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীর স্বামী অন্যস্থানে বাস করেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী ১১.৪% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব শিক্ষা অর্জনকারী ১৯.৮% নারীর স্বামী অন্যত্র অবস্থান করেন" (*Ibid, p. 46*)। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে নারীদের স্বামীদের অন্যস্থানে বসবাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রজনন হার হ্রাসের সম্ভাবনা বাড়ছে।

ইতোপূর্বে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীদের (২০-৪৯ বয়স গ্রুপের) বিয়ের মধ্যক বয়স ১৫ বছর এবং এটাকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ৫০.৭% নারী সঠিক সময়ে বিয়ে করেছেন বলে মনে করেন আবার মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী নারীদের বিয়ের মধ্যক বয়স ১৯.৯ বছর এবং উক্ত গ্রুপের ৭০.১% নারী সঠিক সময়ে বিয়ে করেছেন বলে মনে করেন'(*Ibid, p. 47*)। লক্ষ্যণীয় যে, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনরা স্বল্প বয়সে বিয়ে করাকে (বলা যায় বাল্য বয়সে) এবং অধিক শিক্ষা অর্জনকারী নারীরা বিয়ের বৈধ বয়সকেই সঠিক বয়স বলে মনে করেন।

প্রজনন হার/উর্বরতা (Fertility) বনাম শিক্ষা

প্রজনন হারের সাথে জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে। সারণি-১৫ তে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে শিক্ষাস্তর ভেদে প্রজনন হার ও প্রজনন আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কিত জরিপের তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ২০১৪ সালে নারীদের মোট প্রজনন হার ছিল ২.৩ জন সন্তান। শিক্ষাস্তরের সাথে প্রজনন হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট প্রজনন হার (Fertility rate) হ্রাস পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের মোট প্রজনন হার হলো ২.৪ এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের মোট প্রজনন হার হলো ২.০ জন সন্তান। এটা মূলত চলতি/বর্তমান (২০১৪ সালের) মোট প্রজনন হার প্রকাশ করছে। অপরদিকে ৪০-৪৯ বছর বয়স গ্রুপের নারীদেরও শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে মোট প্রজনন হারের কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীদের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকারী নারীগণ দু'টি সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে অধিকতর সময় (Interval) নেন যা নারী এবং শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও ধনাত্মক ভূমিকা পালন করে।

অল্পবয়সে গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব অর্জন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, সমাজ ও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। নারীরা অল্পবয়সে মা হওয়ার কারণে শিক্ষা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয়, ভবিষ্যতে গৃহের বাইরে নিয়োজন বা উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত হতে বাধাগ্রস্ত হয় যা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সঙ্কুচিত করে। সারণি-১৫ থেকে দেখা যায় যে, ১৫-১৯ বছর বয়সের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ৪৮.৩% নারী গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব অর্জন করেন, মাধ্যমিক স্তর অসমাপ্ত নারীদের ২৯.৯% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী নারীদের ১৭.৪% অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব অর্জন করেন। উল্লেখিত বয়সে বাংলাদেশের মোট ৩০.৮% নারী গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব অর্জন করেন। বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব অর্জনের প্রবণতা হ্রাস পায়।

সারণি- ১৫: বাংলাদেশে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী প্রজনন হার ও আচরণের পরিবর্তন ২০১৪

শিক্ষাস্তর	মোট প্রজনন হার	৪০-৪৯ বয়স গ্রুপের নারীদের এ পর্যন্ত গড় সন্তান জন্মদান	পূর্ববর্তী সন্তান জন্মদানের পর মধ্যক সংখ্যক মাস (জন্মদানে বিরত থাকা)	অল্পবয়সে (১৫-১৯) গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব অর্জন করা (%)	বিবাহিত নারীদের (১৫-৪৯) গড় আদর্শ সংখ্যক সন্তান	কাঙ্খিত সংখ্যক সন্তান জন্মদানে স্বামী-স্ত্রী মতৈক্য
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	২.৪	৪.২	৪৯.৯	৪৮.৩	২.৪	৭৬.৫
প্রাথমিক স্তর অসমাপ্ত	২.৫	৪.১	৪৯.৯	৪৫.২	২.২	৭৫.৩
প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত	২.৪	৩.৯	৫২.৪	৪৩.০	২.২	৮০.২
মাধ্যমিক স্তর অসমাপ্ত	২.৪	৩.৪	৫১.৯	২৯.৯	২.১	৮০.৭
মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তর সমাপ্ত	২.০	২.৪	৫৬.২	১৭.৪	২.০	৮২.৪
মোট	২.৩	৩.৯	৫১.৭	৩০.৮	২.২	৭৮.৯

Source: NIPORT (2016), Bangladesh Demographic and Health Survey 2014, pp. 52, 63, 69, 72

বাংলাদেশের নারীরা (১৫-৪৯ বছর বয়স) গড়ে ২.২ জন সন্তান প্রসব করলেই তাকে গড় আদর্শ সংখ্যক সন্তান হিসেবে মনে করেন। এতে বোঝা যায় নারীদের মাঝে গর্ভনিরোধক সামগ্রী ব্যবহার করে অনাকাঙ্খিত সন্তান জন্মদানে বিরত থাকার প্রচেষ্টা রয়েছে। ২০১৪ সালের জরিপের তথ্যে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নারীদের মাঝে গড় আদর্শ সন্তান সংখ্যা ২.৪ জন, মাধ্যমিক স্তর অসমাপ্তকারীদের মাঝে ২.১ জন এবং মাধ্যমিক

ও তদুর্ধ্ব স্তর সমাপ্তকারী নারীরা ২.০ জন সন্তান জন্মদানকেই গড় আদর্শ সন্তান সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। দেখা যাচ্ছে যে, সন্তান প্রজনন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষাবিহীন/স্বল্প শিক্ষিত নারীদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত নারীদের মতামত প্রাধান্য পাচ্ছে। এভাবে নারীদের মতামতের প্রাধান্য পেলে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন হ্রাস পাবে যা নারীদের ক্ষমতায়নের বহিঃপ্রকাশ। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৮০% নারীর মতামত হলো নারীরা যত সংখ্যক সন্তান জন্মদান করতে চান তাদের স্বামী তাদের সাথে সহমত/একমত পোষণ করেন। তবে শিক্ষার স্তর ভেদে সহমত পোষণের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এতে দেখা যায় নারীদের মতামতের গুরুত্ব স্বামীদের নিকট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশেষত শিক্ষাবিহীনদের তুলনায় শিক্ষিত নারীদের মতামত সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বসহ মূল্যায়িত হচ্ছে।

শিক্ষা এবং জন্মশাসন/পরিবার পরিকল্পনা

জন্মশাসন/পরিবার পরিকল্পনা শিশু, মা, পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি, দেশের জনসংখ্যা সীমিত রাখা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মা ও সন্তানের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাসে জন্মশাসনের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (FY2016 - FY2020) জাতিসংঘের প্রস্তাবিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য "মোট প্রজনন হার হ্রাসের (২০১৪ সালের গড়ে নারী প্রতি ২.৩ জন সন্তানের স্থলে ২০২০ গড়ে নারী প্রতি ২.০ জন) জন্য কিশোর/কিশোরীদের এবং পুনরুৎপাদনশীল স্বাস্থসেবা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, গর্ভনিরোধক বিস্তারের হার ২০১৪ সালের ৬২.৪% থেকে ২০২০ সালে ৭৫% এ উন্নীত করার (*GED, 2015, 7th Five Year Plan, FY2016 - FY2020, Planning Commission, pp. 514-15*) লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিয়ে করা নারীদের (১৫-৪৯ বছর) "৭৪.৪% এর পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের চাহিদা রয়েছে, তন্মধ্যে ৭২.৬% নারী আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করেছে" (*NIPORT, 2016, Bangladesh Demographic and Health Survey 2014, pp. 92-93*)। কিন্তু শিক্ষাস্তর ভেদে মোট পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের চাহিদা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের চাহিদা ৭১.৮%, প্রাথমিক শিক্ষা অসমাপ্তকারীদের চাহিদা ৭৫.২%, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব শিক্ষাস্তর সমাপ্তকারীদের চাহিদা ৭৪.৯% (সারণি-১৬)। ধারণা করা যায় যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে নারীদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় যা শিক্ষা গ্রহণের ধনাত্মক দিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের ৬২.৪% নারী যে কোন জন্মশাসন (contraceptive) পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। শিক্ষাস্তরের প্রকারভেদে জন্মশাসন পদ্ধতি ব্যবহারের সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য Dreze J. এবং Sen A.-এর মতে, "High levels of awareness of family planning matters among Bangladeshi women, and a much higher use of modern contraceptive methods than in India" (*Dreze J. & Sen A., 2013, An Uncertain Glory India and its contradictions, Penguine Books Ltd, London, p. 64*)

Dreze J. & Sen A.-এর বক্তব্য আশাব্যঞ্জক হলেও দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মাত্র ৫৪.১% নারী (১৫-৪৯ বছর বয়সের) কোন না কোন আধুনিক জন্মশাসন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। আধুনিক জন্মশাসন পদ্ধতির একটি হলো বড়ি (Pill) ব্যবহার। বাংলাদেশের ২৭.০% নারী জন্ম শাসনে বড়ি ব্যবহার করছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের তুলনায় শিক্ষা অর্জনকারীদের মাঝে বড়ি ব্যবহারের প্রবণতা অধিক। নারীদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে কনডম ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৪ সালের জরিপ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের ৩৭.৬% নারী জন্মশাসন পদ্ধতি ব্যবহার থেকে বিরত ছিলেন। শিক্ষাবিহীন এবং স্বল্প শিক্ষিত নারীদের মাঝে জন্ম শাসন পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরতির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এর অর্থ হচ্ছে অধিক শিক্ষিত নারীরা অধিক হারে জন্মশাসন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। আবার দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষিত নারী ও পুরুষদের মাঝে বন্ধ্যাকরণের (Sterilization) হার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের তুলনায় কম। জরুরি জন্মশাসন বড়ি বলতে এমন বড়িকে

বোঝানো হয় যা নারীরা অনিরাপদ (Unprotected) সহবাসের পর গ্রহণ করে জন্মশাসন নিশ্চিত করেন। ২০১৪ সালের জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিগত এক বছরে বাংলাদেশের ৬.১% নারী জরুরি জন্মশাসন বড়ি গ্রহণ করেন এবং জাতীয় শতকরা হারের তুলনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারীরাই অধিক হারে জরুরি জন্মশাসন বড়ি ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, "Maternal education is reflected in healthy reproductive behavior, better timing and spacing during pregnancies and increased participation of the mother in family planning process" (*Aroni B, et. al., 2015, "Determinates of Antenatal care and its impact of Child Health in Bangladesh", Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 31, No. 1, p. 247)*

পরিবার পরিকল্পনা/জন্মশাসন সম্পর্কে নারী/পুরুষ বিভিন্নভাবে জ্ঞান অর্জন করেন। নারীরা কিছুটা নিজেদের সাধারণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, গণমাধ্যম, বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট, সমাজ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মী, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, কমিউনিটি ক্লিনিক, এনজিও প্রভৃতির মাধ্যমে জ্ঞান সমৃদ্ধ হন। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার বার্তা/সংবাদ প্রচারের সর্বাপেক্ষা উত্তম মাধ্যম হলো টেলিভিশন। বর্তমানে বিবাহিত নারীদের (১৫-৪৯ বছর বয়সী) ১৯.২% টেলিভিশনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। যেসব নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের ৮.৬%, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারীদের ১৫.৯%, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী নারীদের ৩৯.৪% টেলিভিশনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হন। গণমাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের নিদেনপক্ষে একটি উৎস থেকে বাংলাদেশের ৩০% নারী পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের ১৭.৬%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের ২৮%, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারীদের ৫০.৮% কমপক্ষে একটি উৎস থেকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হন (সারণি-১৬)। দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা নানাভাবে মানুষের/সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের মানুষের পুনরুৎপাদনশীল আচরণে ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করছে যা বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এছাড়াও "The unwillingness of educated women to be shackled (বেড়িপরানোর/শৃঙ্খলিত করা) to continuous child rearing clearly plays a role in bringing about this change. Education also makes the horizon of vision wider, and, at a more mundane (জাগতিক) level, helps to disseminate the knowledge of family planning. And of course educated women tend to have greater freedom to exercise their agency in family decisions, including in matters of fertility and childbirth" (*Sen A., 1999, Development bs Freedom, Oxford University Press, New Delhi, p. 199*)

সারণি- ১৬: বাংলাদেশে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তথ্য জানা-২০১৪ (১৫-৪৯ বছর বয়সী)

শিক্ষাস্তর	পরিবার পরিকল্পনার মোট চাহিদা	যে কোন জন্মশাসন পদ্ধতি ব্যবহার (১৫-৪৯ বছর বয়স)	বড়ি ব্যবহার	কনডম ব্যবহার	বর্তমানে জন্মশাসনে বিরত	নারীদের বন্ধ্যাকরণ	পুরুষদের বন্ধ্যাকরণ	জরুরি জন্মনিরোধক বড়ি সম্পর্কে জ্ঞাত	জরুরি জন্মনিরোধক বড়ি ব্যবহার (বিগত ১ বছরে)	টেলিভিশনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা	কমপক্ষে একটি উৎস থেকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	৭১.৮	৬১.৫	২০.৪	১.৯	৩৮.৫	৭.৪	২.৬	৫.৯	৩.৪	৮.৬	১৭.৬
প্রাথমিক স্তর অসমাপ্ত	৭৫.২	৬৩.৯	২৬.৭	৩.২	৩৬.১	৫.৭	২.০	৮.৭	৪.২	১১.৪	২২.২
প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত	৭৩.৪	৬২.০	২৮.৭	৩.০	৩৮.০	৪.১	০.৯	৮.৫	৬.৩	১৫.৯	২৮.০
মাধ্যমিক স্তর অসমাপ্ত	৭৬.০	৬২.৩	৩১.৬	৬.৯	৩৭.৭	৩.২	০.৫	১৪.০	৪.৭	২৩.১	৩৪.৫
মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তর সমাপ্ত	৭৪.৯	৬৩.০	২৬.৩	১৯.১	৩৭.০	২.২	০.১	৩৭.২	৮.৫	৩৯.৪	৫০.৮
মোট	**৭৪.৪**	**৬২.৪**	**২৭.০**	**৬.৪**	**৩৭.৬**	**৪.৬**	**১.২**	**১৪.০**	**৬.১**	**১৯.২**	**৩০**

Source: NIPORT (2016), Bangladesh Demographic and Health Survey 2014, pp. 75, 81, 94

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০

ক. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১. মানুষের প্রজনন হারকে প্রভাবিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে .....।
২. বিয়ের ফলশ্রুতিতে নারীদের ..... হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
৩. প্রজনন হারের সাথে জনসংখ্যার ..... নির্ভর করে।

সঠিক উত্তরঃ ১। শিক্ষা; ২। গর্ভবতী; ৩। গতি-প্রকৃতি।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ১৯৭০ থেকে ২০৩০ সালের বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা করুন।
২. অমর্ত্য সেন নারী শিক্ষার সাথে জনসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন– সেগুলো সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
৩. নারীদের স্বল্প বয়সে বিয়ের কারণে কী কী নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

1. নারী শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং প্রজনন হারের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
2. পরিকল্পিত পরিবার গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
3. বাংলাদেশের শিক্ষারস্থর অনুযায়ী প্রনন হার এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের গতি-প্রকৃতি বিবৃত করুন।

পাঠ ৬.১১: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষার প্রভাব
Education, Hygiene, Nutrition and Health

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মানুষের অর্জিত শিক্ষা স্তরের সাথে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য পদার্থ ত্যাগের সহ-সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মায়েদের শিক্ষাস্তরের সাথে শিশুদের উচ্চতা ও ওজন নির্ভরতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মায়েদের ও শিশুদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব নির্ণয় করতে পারবেন;
- মায়েদের শিক্ষার সাথে শিশু মৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের ও স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা গ্রহণ প্রভৃতির নির্ভরশীলতা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের অপ্রতুলতা, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অপরিহার্যতা বিশ্লেষণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে "অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং চিকিৎসাকে মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশের সংবিধান; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১, পৃ. ৫) শিক্ষা নিজেই একটি মৌলিক চাহিদা হলেও আবার অন্যান্য মৌলিক চাহিদাসমূহের উৎপাদনের/সৃষ্টির উৎস হিসেবেও কাজ করছে। এসব মৌলিক উপকরণের একটি হলো স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (Hygiene), পুষ্টি (Nutrition)। অন্যান্য মৌলিক উপকরণের উপর শিক্ষা অর্জনের যেমন প্রভাব রয়েছে আবার মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার উপরও শিক্ষার প্রভাব রয়েছে। ''২০১৫ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু (Life expectancy at birth) ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে'' (*UNDP, 2016, Human Development Report 2016, p. 202*)। ধারণা করা যায় যে, মানুষের আয়ু বৃদ্ধিতে অন্যান্য উপাদানের (Factors) সাথে শিক্ষারও একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষা স্তরভিত্তিক পানীয় জলের প্রাপ্যতাকে (Access) বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন গৃহস্থালির প্রধানগণের ২.২৯% সরবরাহকৃত, ৯৩.৪৫% নলকূপের এবং ৪.২৬% অন্যান্য উৎসের পানি পান করেন। এসএসসি/এইচএসসি স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের ১৬.৬৭%, ৮১.৪৩% এবং ১.৯০% যথাক্রমে সরবরাহকৃত, নলকূপের এবং অন্যান্য উৎসের পানি পান করেছেন। স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের ৫২.৬৩% সরবরাহকৃত, ৪৬.৫১% নলকূপের এবং ০.৮৭% অন্যান্য উৎসের পানি পান করেছেন" (*BBS, 2011, Report of the Household Income and Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, p. 93*)। উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গৃহস্থালি প্রধানদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে যা স্বাস্থ্য উন্নয়নে, রোগ সংক্রমণ হ্রাসে ও দীর্ঘায়ু অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে গৃহস্থালি প্রধানদের মলমূত্র/বর্জ্য পদার্থ ত্যাগের পরিবেশের পরিবর্তন দেখা যায়। "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের মাঝে ৩৬.৯১% পাকা পায়খানায়, ৪৬.৮৭% কাচা পায়খানায় এবং ১৬.২৩% খোলা জায়গায় মলমূত্র (বর্জ্য পদার্থ) ত্যাগ করে। এসএসসি/এইচএসসি স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীদের ৮১.১৪% পাকা পায়খানায়, ১৭.৫৪% কাচা পায়খানায়, ১.৩২% খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। তবে স্নাতকোত্তরদের ৯৪.০১% পাকা পায়খানা এবং ৫.৯৯% কাচা পায়খানা ব্যবহার করে" (*Ibid, pp. 93-94*)। শিক্ষাস্তর অনুযায়ী খাওয়ার পরে বাংলাদেশের মানুষের হাত ধোয়ার কোন পরিসংখ্যান পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী নিরাপদ পানীয় পানের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় "হাত ধোয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্তরে/ প্রতিষ্ঠানে স্যানিটারী সুবিধার উন্নয়নে" (*GED, 2015, 7th Five Year Plan, FY2016-FY2020, Planning Commission, p. 520*) গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার সাথে মানুষের পুষ্টি গ্রহণের একটা যোগসূত্রতা রয়েছে। নারীদের শিক্ষা পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিহীনতা দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মায়ের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় বিনিয়োগ করলে তার সন্তানের গর্ভকালীন ও পরবর্তীতে পুষ্টিগত উন্নয়ন সাধিত হয়। এভাবে সন্তানের পুষ্টিগত উন্নয়ন অর্থাৎ

"Nutritional status in turn, influences educational attainments, shaping the future occupational choice and productivity" (*Dasgupta, 1993, An Inquiry into well-being and Destitution; quoted in BIDS, 2001, Fighting Human Poverty-Bangladesh Human Development Report 2000, p. 43*)

সারণি- ১৭: প্রাসঙ্গিক/সমকালীন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থান- ২০১৪

মায়েদের শিক্ষা (প্রাসঙ্গিক / সমকালীন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী)	বয়সের জন্য উচ্চতা (খর্বাকৃতি) (Height for Age)		উচ্চতার জন্য ওজন (পাতলা/হালকা) (Weight for Height)		বয়সের জন্য / বয়স অনুযায়ী ওজন (Weight for Age)		শিশুদের সংখ্যা
	বয়স শতকরা হার -৩ পরিমিত ব্যবধান / আদর্শ বিচ্যুতির নিচে	বয়স শতকরা হার -২ পরিমিত ব্যবধান / আদর্শ বিচ্যুতির নিচে	বয়স শতকরা হার -৩ পরিমিত ব্যবধান / আদর্শ বিচ্যুতির নিচে	বয়স শতকরা হার -২ পরিমিত ব্যবধান / আদর্শ বিচ্যুতির নিচে	বয়স শতকরা হার -৩ পরিমিত ব্যবধান / আদর্শ বিচ্যুতির নিচে	বয়স শতকরা হার -২ পরিমিত ব্যবধান / আদর্শ বিচ্যুতির নিচে	
কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১৮.৪	৪৭.৪	৩.০	১৪.৭	১২.১	৪১.৯	১১৬১
প্রাথমিক অসমাপ্ত	১৬.৬	৪৪.৩	৩.৫	১৪.৬	১০.১	৩৮.৫	১১৬৫
প্রাথমিক সমাপ্ত	১৩.৪	৪৩.২	৩.৬	১৬.৬	১০.৩	৪০.১	৮২৮
মাধ্যমিক অসমাপ্ত	৮.৮	৩৩.২	২.৮	১৩.৯	৫.৯	৩০.১	২৮৬৮
মাধ্যমিক সমাপ্ত ও তদুর্ধ্ব স্তর	৪.১	১৮.৪	৩.৩	১৩.২	৩.১	১৭.৯	১১০১
মোট	**১১.৬**	**৩৬.১**	**৩.১**	**১৪.৩**	**৭.৭**	**৩২.৬**	**৭৩১৮**

Source: NIPORT (2016), Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2014, p. 154

২০১৪ সালে সম্পন্ন জরিপে বাংলাদেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিহীনতার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় (সারণি- ১৭) যে, জাতীয়ভাবে ৩৬.১% শিশু মধ্যকের (Median) নিচে দুই পরিমিত ব্যবধান/আদর্শ বিচ্যুতিতে (–2 Standard Deviation) অবস্থান করছে। এর অর্থ হলো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার মানের তুলনায়

আমাদের দেশের ৩৬.১% শিশু খর্বাকৃতির। এতে আমাদের দেশের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের দীর্ঘস্থায়ী ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। কোন শিশু যদি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্দেশিত মধ্যকের (Median) থেকে তিন পরিমিত ব্যবধান/আদর্শ বিচ্যুতির নিচে (-3 standard deviation) অবস্থান করে তবে তাকে প্রচণ্ড খর্বাকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের ১১.৬% শিশু প্রচণ্ড/অতি খর্বাকৃতির। মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে খর্বাকৃতি এবং অতি খর্বাকৃতি সন্তানের হার হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ১৪.৩% শিশু হালকা এবং ৩.১% শিশু অতিরিক্ত হালকা (পাতলা)। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশুদের মায়ের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে হালকা শিশুর হার কমার প্রবণতা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বাংলাদেশের ৩২.৬% শিশুর বয়স অনুযায়ী কম ওজন রয়েছে এবং ৭.৭% শিশুর বয়স অনুযায়ী ওজন অতিরিক্ত কম। তবে মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে শিশুদের স্বল্প/কম ওজন (Under Weight) হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন মায়েদের ৪১.৯%এবং ১২.১% শিশু যথাক্রমে কম ওজন ও অতিরিক্ত কম ওজন সম্পন্ন (বয়স অনুযায়ী)। আবার মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ১৭.৯% শিশু স্বল্প ওজন সম্পন্ন এবং ৩.১% শিশু অত্যন্ত কম ওজন সম্পন্ন।

ভিটামিন 'এ' মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র পুষ্টিকর পদার্থ (Micronutrient)। শিশুদের অতিরিক্ত ভিটামিন এ ঘাটতি থেকে অন্ধত্ব সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ভিটামিন 'এ' -এর অভাবে হাম, ডায়রিয়া ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ শিশুদের আক্রমণ করতে পারে এবং অসুস্থতা থেকে সুস্থ হতে দীর্ঘসময় প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণত টাটকা ও সবুজ শাকসব্জি, পনির, গাজর, ডিম, মাখন, মাছ প্রভৃতিতে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি পূরণের জন্য সাধারণত ৬-৫৯ মাসের শিশুদের মাঝে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ করা হয়। ধরে নেয়া হয় জন্মের পর থেকে শিশুরা বুকের দুধের (Breastfeeding) মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' এর অভাব পূরণ করবে। আবার শিশুদের রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে এবং রক্তস্বল্পতা থেকে রক্ষা পেতে হলে লৌহ বা আয়রণ আছে এমন খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত ফল, মাংস এবং সবুজ শাকসব্জি থেকে লৌহ (Iron) পাওয়া যায়। ২০১৪ সালে সম্পাদিত জরিপের ফলাফল (সারণি-১৮) থেকে দেখা যায় যে, ৬-২৩ মাস বয়সী শিশু যারা মায়ের সাথে থাকে জাতীয়ভাবে তাদের ৬৬.৯% বিগত বছরগুলোতে ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার খেয়েছে। তবে মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত ২৪ ঘণ্টায় (অর্থাৎ জরিপের পূর্বের ২৪ ঘণ্টায়) ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবারের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। বলা যেতে পারে যে, যেসব মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁরা সন্তানদের বেশি পরিমাণে ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার দিচ্ছেন, ফলে তাদের সন্তানদের ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতিজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। একই ধরনের সিদ্ধান্ত লৌহযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অসমাপ্ত এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মা ব্যতীত অন্যদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে বিগত ৬ মাসে তাদের সন্তানদের ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ অধিক খাদ্য খাওয়ানোর প্রবণতা দেখা যায়। আবার মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সন্তানদের বিগত সাত দিনের মধ্যে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের পাকস্থলি থেকে মলদ্বার (Intestine) পর্যন্ত অবস্থানকারী কিছু পরভুক প্রাণী (Parasites) এ্যানিমিয়া (Anemia) বা রক্তস্বল্পতা সৃষ্টি করতে পারে। এটা সাধারণত নানা ধরনের ক্রিমি দ্বারা সংগঠিত হয়। শিশুদের এসব কীটমুক্ত করতে (Deworming) ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের ৩৯.৮% শিশুর জন্য বিগত ৬ মাসে অর্থাৎ ২০১৪ সালের জরিপপূর্ব ৬ মাস সময়ে কীটমুক্তির লক্ষ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে তাঁদের সন্তানদের কীটমুক্তকরণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ শিশুদের রক্তস্বল্পতা দূর করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদেরকে শারীরিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম করে তুলবে।

মায়েদের গ্রহণ করা খাদ্যই জন্মের পূর্বে শিশুদের শারীরিক গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রয়োজনীয় পুষ্টিগত মানসম্পন্ন খাদ্য শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের উপর ধনাত্মক অবদান রাখে। "Maternal night blindness due to vitamin A deficiency (VAD) has been associated with increased low birth weight (Tielsch et. al. 2008) and infant mortality (Christian et. al. 2001)" (*Quoted in NIPORT, 2016, Bangladesh Demographic and Health Survey 2014, p. 173*)

তবে ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি পূরণের জন্য সন্তান জন্মদানের পর প্রথম ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে (প্রায় দুই মাস) মায়েদের উচ্চ মাত্রার (২০০০০০IU) ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো যেতে পারে যা মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে সন্তানকেও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ করবে, ফলে সন্তান সম্ভাব্য ঝুঁকিমুক্ত হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সন্তান জন্মদানের দুই মাসের ভেতর ৪৫.৯% মা ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করেছেন। তবে যারা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি তাদের ৩৯.৮% উল্লিখিত সময়ে ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করেছেন। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া (প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারী) দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে মায়েদের ভিটামিন 'এ' গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষিত মায়েরাই শিক্ষাবিহীনদের (প্রাতিষ্ঠানিক) তুলনায় সন্তান ও নিজের খাদ্য ও পুষ্টিমান বজায় রাখতে তুলনামূলকভাবে অধিক উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করছে যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সুস্থ্য-সবল, মেধাসম্পন্ন, উচ্চ উৎপাদনশীলতা সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টিতে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশের মা ও শিশুর অসুস্থ্যতা ও মৃত্যু কমিয়ে আনার মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) কিছু লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলো "প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী (পাঁচ বছরের নিচে) শিশুর মৃত্যুহার ২০১৪ সালের ৪৬ জন থেকে ২০২০ সালে ৩৭ জনে কমিয়ে আনা; প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর (Infant) মৃত্যুহার ২০১৪ সালের ৩৮ জন থেকে ২০২০ সালে ২০ জনে কমিয়ে আনা; মাতৃ মৃত্যুর হার (১০০০০০ জীবিত জন্মদানকারী) ২০১৩ সালের ১৭০ জন থেকে ২০২০ সালে ১০৫ জনে নামিয়ে আনা" (*GED, 2015, 7th Five Year Plan, FY 2016-FY 2020, Planning Commission, Table 10.3; p. 515*)।

উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তবে শিশুদের মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় স্বাস্থ্যসম্মত ও সঠিকভাবে পরিচর্যার উপর শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার নির্ভর করে। ২০১৪ সালে সম্পাদিত জরিপ থেকে দেখা যায় যে, "৬৩.৯% নারী গর্ভকালীন চিকিৎসায় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীনদের ৩৯.০%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের ৫৫.৪% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারীদের ৮৯.৪% গর্ভকালীন সময়ে চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন" (*NIPORT, 2016, Bangladesh Demographic and Health Survey, BDHS, 2014, p. 113*)।

দেখা যাচ্ছে যে, গর্ভকালীনসময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন মায়েদের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মায়েরা অধিক হারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করছেন এবং এতে গর্ভকালীন জটিলতা নিরসনের/হ্রাসের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, "An additional year in mother's education increases the odds for utilizing professional antenatal care by 8%" (*Aroni B. et. al., 2015, Determinants of Antenatal Care and its impact on Child Health in Bangladesh, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 31, No. 1, p. 242*)

সারণি- ১৮: বাংলাদেশের শিশু ও মা-দের ক্ষুদ্র পুষ্টিকর/পুষ্টিদায়ক খাবার গ্রহণ- ২০১৪

মায়েদের শিক্ষা (প্রাসঙ্গিক/সমকালীন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী)	৬-২৩ মাস বয়সী শিশু যারা মায়ের সাথে থাকে			৬-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশু				১৫-৫৯ বছর বয়সী মা , শিশু জন্মের ২ মাসের মধ্যে ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করেছে	
	যারা বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার খেয়েছে (%)	যারা বিগত ২৪ ঘণ্টা আয়রণ যুক্ত খাবার খেয়েছে (%)	শিশুদের সংখ্যা	বিগত ৬ মাসে ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে (%)	বিগত ৭ দিনের মধ্যে আয়রণের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে (%)	বিগত ৬ মাসে ক্রিমি জাতীয় কীটের ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে (%)	শিশু সংখ্যা	যারা শিশু জন্মের ২ মাসের মধ্যে ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করেছে (%)	নারীদের সংখ্যা
কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	৫৮.৮	৪৪.৩	৩৩১	৫৭.৫	৩.৪	৩৬.২	১১৮৯	৩৯.৮	৬৫৫
প্রাথমিক শিক্ষা অসমাপ্ত	৬০.৫	৪৪.৫	৩৬৫	৫৫.৭	৩.৭	৩৭.৯	১১৪৬	৪০.৩	৭৪৯
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত	৬৫.২	৫৪.৩	৩০৩	৫৫.১	৩.৫	৪০.৯	৮২০	৩৬.৭	৫৪৪
মাধ্যমিক শিক্ষা অসমাপ্ত	৬৮.৬	৫৮.৩	১০৩৫	৬৪.৮	৪.২	৪০.১	২৮৫৯	৪৯.০	১৮৯২
মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত ও তদুর্ধ্ব স্তর	৭৬.২	৬৭.১	৪০৮	৭১.৯	৭.১	৪৩.৯	১০৯০	৫৫.৪	৭৮৭
মোট	৬৬.৯	৫৫.৩	২৪৪২	৬২.১	৪.৩	৩৯.৮	৭১০৩	৪৫.৯	৪৬২৭

Source: NIPORT (2016), Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2014, pp. 168, 173

মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় শিশু ও মায়েদের সেবা গ্রহণের পর যাতে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং ডেলিভারীকালীন/সন্তান প্রসবের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগিতা নেয়া অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এতে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস করা যায়। জরিপের তথ্যে দেখা যায় যে, "বাংলাদেশের ৪২.১% মা শিশু জন্মকালীন চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (চিকিৎসক, নার্স, ধাত্রী প্রভৃতি) সেবা পেয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন মায়েদের ক্ষেত্রে ১৭.১%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ৩৩.৫% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ৭৫.০% সন্তান প্রসবকালে প্রশিক্ষিত চিকিৎসাকর্মীর সেবা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের ৩০.৯% জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মা প্রসবকালে প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে মায়েদের প্রসবকালীন প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ১০.৬%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ২২.২% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারী ৬৩.২% মা প্রসবকালে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করেছেন (NIPORT (2016), BDHS, Ibid, p.123)। এছাড়া জন্মের পর নবজাতক ও মায়ের স্বাস্থ্য সেবা নিরাপদ মাতৃত্ব ও নবজাতকের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু ও নবজাতকের প্রসব পরবর্তী জটিলতা নিরসনে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শ মা ও নবজাতকের মৃত্যুরোধে অত্যন্ত জরুরি। ২০১২ সালের ইউনিসেফের মন্তব্যে বলা হয় যে, "A large proportion of maternal and neonatal deaths occur during the 24 hours following delivery. In addition, the first two days following delivery are critical for monitoring complications for both mothers and their newborns" (*Ibid, p. 124*).

বাংলাদেশের শিশু জন্মের পর ৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের সাহায্যে "২৭.৬% মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রেও শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার হার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে শিশু জন্ম গ্রহণের দুই দিনের মধ্যে বাংলাদেশে ৩৬.৪% মায়ের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মীর সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন মায়েদের মধ্যে ১৬.০%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ২৬.৫% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপনকারী ৬৬.২% মা সন্তান জন্মদানের দুই দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য/শারীরিক পরীক্ষা করেন। আবার নবজাতকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতীয়ভাবে ৩১.৫% নবজাতকের জন্মের দুই দিনের মধ্যে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন মায়েদের ১২.৪%, পঞ্চম শ্রেণি সমাপ্তকারী মায়েদের ২৪.১% এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী মায়েদের ৫৮.৬% শিশু জন্মের দুইদিনের ভেতর প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মীদের সাহায্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়" (*Ibid, pp.126-127, 129*)।

শিশুদের জন্মের সময় তাদের আকার (Size) ও ওজন (weight) মায়ের এবং গর্ভজাত শিশুর প্রাপ্ত পুষ্টি মানের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে শিশুদের জন্মকালীন আকার ও ওজন পরবর্তীতে তাদের রোগ প্রতিরোধের এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। কারণ "Children whose birth weight is less than 2.5 kilograms, i. e. low birth weight (LBW), have a higher than average risk of early childhood death" (*Ibid, p. 137*).

২০১৪ সালে সম্পাদিত Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS)-তে শিশুদের জন্মকালীন আকার ও ওজনের পরিসংখ্যান গ্রহণ না করে মায়েদের ধারণার উপর ভিত্তি করে দেখানো হয়েছে যে, "বাংলাদেশের ৭৯.৯% শিশু গড় অথবা তদপেক্ষা অধিক আকার ও ওজনসহ জন্মগ্রহণ করেছে। যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই সেসব মায়েদের ৭৩.১%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ৮১.৫%, মাধ্যমিক বা তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী মায়েদের ৮৫.৫% শিশু গড় বা তদুর্ধ্ব আকার ও ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে"। (*Ibid, p.138*)

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলো ডায়রিয়া (Diarrhea)। ২০১৪ সালের জরিপের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, "প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি এমন ধরনের মায়েদের পাঁচ বছরের নিচের বয়সের শিশুরা (৫.৯%) বিভিন্ন ধরনের ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ৬.১%, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের ৩.৮% শিশু বিভিন্ন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে" (*Ibid, p.142*)। দেখা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা অর্জনকারী মায়েদের শিশুরা তুলনামূলকভাবে ডায়রিয়ায় কম আক্রান্ত হচ্ছে।

শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসার দাবি রাখে। BDHS-এর তথ্যানুসারে "এক হাজার জন্ম গ্রহণকারী শিশুর মধ্যে পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ১৯৮৯-১৯৯৩ সালে ১৩৩ শিশু মৃত্যুবরণ করতো এবং ২০১০-২০১৪ সালে উক্ত বয়সের শিশুদের প্রতি হাজারে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। মায়েদের শিক্ষাস্তর বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, যেসব মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই ২০১০-২০১৪ সালে তাদের প্রতি হাজার জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে ৫০ জন পাঁচ বছর বয়সের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারী মায়েদের প্রতি হাজারে পাঁচ বছর বয়সের নিচে মৃত্যুবরণকারী শিশুর সংখ্যা ৪৫ জন এবং মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব স্তরের মায়েদের ২৭ জন" (*Ibid, pp.102-103*)।

এ পর্যন্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মায়েদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে শিশু ও নারীদের পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে শিশুদের মাঝে খর্বাবৃতি সন্তানের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং কাঙ্ক্ষিত গড় ওজনসহ জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানব পুঁজির তিনটি উপাদান হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি। ধারণা করা যায় যে, একটির প্রাপ্যতা অন্যটিকে ধনাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা মানব পুঁজির উপাদানগুলোর উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে মাথাপিছু স্বাস্থ্য খাতে ২৭ মার্কিন ডলার ব্যয় করছে। "According to an estimate, US $ 54 per capita is required to attain a fully functioning health system and to cover a basic package of services including interventions targeting non-communicable diseases by 2015" (*GED, 2015, 7th Five Year Plan, FY 2016-FY 2020, Planning Commission, p. 514*).

অবশ্য মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৬ অনুসারে দেখা যায় যে, ''বাংলাদেশ ২০১৪ সালে জিডিপি-র ০.৮% স্বাস্থ্যখাতে এবং ২০১০-২০১৪ সালে ২% শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে। অথচ একই সময়ে ভারত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যথাক্রমে জিডিপি-র ১.৪% ও ৩.৮% ব্যয় করেছে" (*UNDP, 2016, Human Development Report 2016, pp. 231-234*) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর বিনিয়োগ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের মানুষের পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতমানের মানব পুঁজি সৃষ্টি করতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ নয়?
ক. শিক্ষা
খ. অন্ন
গ. চিকিৎসা
ঘ. মাটি

২. ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা কতজন শিশু প্রচন্ড খর্বাকৃতির?
ক. ৮.২
খ. ৯.৩
গ. ১১.৬
ঘ. ১৩.৭

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গৃহস্থালি প্রধানদের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধিতে কি সুবিধা হতে পারে?
২. শিক্ষার সাথে মানুষের পুষ্টি গ্রহণের যোগসূত্রতা লিখুন।
৩. ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের কি অসুবিধা হতে পারে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. “শিক্ষিত মায়েরাই মূলত: ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সুস্থ-সবল, মেধাবী, উচ্চ-উৎপাদনশীলতা সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টিতে অবদান রাখবে”– ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং শিক্ষিত ও সুস্থ জাতি গঠনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিকল্পনা যুক্তিসহ প্রস্তাব করুন।

পাঠ ৬.১২: শিক্ষা, গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
Education, Democracy and Political Stability/Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গণতন্ত্রের ধারণা এবং বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- গণতান্ত্রিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মানুষের ধৈর্য/সহিষ্ণুতার উপর শিক্ষার প্রভাব নিরূপণ করতে পারবেন এবং
- রাজনৈতিক স্থিতিশলীতায় শিক্ষার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

গণতন্ত্র বা Democracy-র মূল শব্দটি গ্রীক Demokratia থেকে এসেছে যার মানে হলো জনগণের শাসন। আধুনিক কালে গণতন্ত্র হলো এমন সরকার ব্যবস্থা যাতে জনগণ/নাগরিকগণ তাদের মধ্য থেকে সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং উক্ত প্রতিনিধিরা একটি শাসন পরিচালনাকারী পরিষদ বা পার্লামেন্ট গঠন করে। কোন কোন সময় গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও বলা হয়।

কোন দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি সূচক/নির্ণায়ক হিসেবে গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয়। আজকের গণতন্ত্র দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমা, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটি একটি ছোট এলাকা নিয়ে গঠিত হতো। এসকল নগর রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রচলিত ছিল। এসকল গণতান্ত্রিক/রাজনৈতিক কার্যকলাপে স্বল্পসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিক (নারী, দাস এবং আবাসিক বিদেশী ব্যতীত) নিয়োজিত থাকত। প্রাচীন গ্রীসের পর মধ্যযুগে নানা ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিপ্লব (১২১৫ সালের ইংরেজ ম্যাগনাকাটা- Magna Carta*, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ও আমেরিকার বিপ্লব) এবং ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় পুরুষ ও নারীদের ভোটাধিকার গণতন্ত্রকে উন্নত ব্যবস্থায় উন্নীত করে। তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশসমূহে "The idea of democracy was established as a form of government to which any nation is entitled .... The flowering of democratic practice and its reach are, however, a continuing process" (*Dreze J. & Sen A.; 2013, An Uncertain Glory, Penguine Book Ltd, England, p. 243*).

গণতন্ত্রের ধারণা এখনো বিকশিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের ধারণা বা সর্বসম্মত সংজ্ঞায় আজো উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। "Democracy is a form of government in which all adult citizens share equally in every aspect of governing – or at least have an equal legal title to do so" (*Lipset S. M., Editor in Chief, 1995, The Encyclopedia of Democracy, vol. 11, Washington D. C., p. 392*). Dreze J. এবং অমর্ত্য সেন "গণতন্ত্রকে মুক্ত/উন্মুক্ত নির্বাচন, ভোট প্রদান ছাড়াও Public Reasoning এবং The requirement of equal participation-এর উপর জোর দিয়েছেন। Public Reasoning বলতে Dreze এবং সেন মানুষের

* English Magna Carta of 1215- (ম্যাগনা কাটা) হচ্ছে ব্রিটিশ স্বাধীনতার দলিল। ব্রিটিশদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত একটি নাম, যেটিকে বলা হয় ব্রিটিশ গঠনতন্ত্রের বাইবেল। ১৫ জুন, ১২১৫ সালে কিং জন বিদ্রোহীদের সাথে অনেক আলোচনা করে, আক্ষরিক অর্থে তাদের মতের প্রতিফলন ঘটিয়ে ঐতিহাসিক এই দলিলে সই করেন। এই দলিলে রাজার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস করা হয় এবং রাজ্য পরিচালনায় জনমতের প্রতিফলনের (Liberty) ব্যবস্থা করা হয়।

মতামত উপস্থাপন, অন্যের মতামত/যুক্তি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টিকে বুঝিয়েছেন। এটা হতে পারে গণমাধ্যম, জনসভা, কথোপকথন, আন্দোলন, শোভাযাত্রা, প্রচার, ধর্মঘট, বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যে" (*Dreze J. & Sen A.; 2013, An Uncertain Glory, pp. 257-260*)। আবার কোন কোন গবেষক গণতন্ত্রকে চারটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

1. "Free, competitive and fair" elections;
2. An actual transfer of power resulting from the elections;
3. No sizable parts of the population excluded from the franchise (ভোটাধিকার);
4. Regime (শাসন ব্যবস্থা/সরকার পদ্ধতি) stability. (Papaioannou E, Siourounis G (2008), Economic and Social factors driving the third wave of democratization, in Journal of comparative Economics, www.sciencedirect.com).pp 367-368)

এ পর্যন্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্রের ধারণাটি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ নানাবিধ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং গণতন্ত্রের ধারণাটি এখনো বিকশিত হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতায় শিক্ষার অবদান

প্লেটো তাঁর 'দি রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রে শিক্ষা অর্জনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন, "নাগরিকেরা যদি যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা তাদের সমস্যাসমূহকে অতিক্রম করতে পারবে এবং যে কোন জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করতে পারবে। ... দেখা উচিত নাগরিকদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা রাষ্ট্রের ঐক্য, সংহতি এবং উন্নতির সহায়ক কিনা। ... তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় কিশোরদের কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষা দিয়ে শেষ করা হবে এবং উচ্চ শিক্ষা দুটি শাসক শ্রেণির মধ্য হতে নির্বাচিত কুড়ি হতে পঁয়ত্রিশ বছরের নারী-পুরুষদের দেওয়া হবে" (*হিমাংশু ঘোষ, ১৯৮৮, রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস, সারদা প্রেস, কলিকাতা, পৃ: ৫৪-৫৫*)। দেখা যাচ্ছে যে, প্লেটো রাষ্ট্রের উন্নয়ন, স্থিতিশীলতায় শিক্ষার অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে, অধিকতর শিক্ষা অর্জনকারী দেশসমূহে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশলীতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ বক্তব্য অধিকাংশ দেশের জন্যই বাস্তব সম্মত হলেও ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে বিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে নাৎসী ও ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এসকল দেশে বিশেষত:

"Germany is an example of a nation in which the structural changes–growing industrialization, urbanization, wealth and education all favored the establishment of a democratic system, but in which a series of adverse historical events prevented democracy from securing legitimacy in the eyes of many important segments of society, and thus weakened German democracy's ability to withstand crisis" (*Lipset, S. M; March, 1959, Some Social Requisites of democracy: Economic Development and Political Legitimacy, In The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, p. 72*)

এছাড়াও বর্তমান সময়ের এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত শিক্ষা, শিল্পায়ন, শহরায়ন, সম্পদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও অনেক দেশেই এখনো একনায়কত্ব (Dictatorship) বিরাজমান। সাধারণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার শিক্ষাও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তথ্য

সংগ্রহ, বিশ্লেষণে সক্ষম হয়ে উঠেন। ফলে তাঁরা রাজনৈতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অধিকার, নারীর অধিকার, মানবাধিকার, কাজের পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মাঝে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায় যা- "(১) নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, (২) রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি গড়ে তুলতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে, (৩) রাজনৈতিক সমন্বয় ও জাতীয় সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে" (*লতিফ আ. হ. ২০০৩, শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্যাপিরাস, ঢাকা, পৃ. ৪৩*)।

১৯৫৯ সালে Lipset, S. M তাঁর Some Social Requisites of democracy: Economic Development and Political Legitimacy নামক গবেষণা প্রবন্ধে গণতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য কোন দেশের গড় সম্পদ (মাথাপিছু আয়), শিল্পায়নের স্তর, শহরায়ন এবং শিক্ষা অর্জনের স্তরকে বিবেচনায় নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, অধিকতর গণতান্ত্রিক দেশে উপর্যুক্ত সূচকসমূহের মাত্রা বেশি থাকে। তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণের জন্য তিনি ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহকে বেছে নিয়েছেন। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, "The more democratic" countries of Europe are almost entirely literate: The lowest has a rate of 96 percent, while the "less democratic" nations have an average literacy rate 85 percent. In Latin America, the difference is between an average rate of 74 percent for the "less dictatorial" countries and 46 percent for the "more dictatorial". The educational enrolment per thousand total population at three different levels, Primary, Post Primary, and higher educational, is equally consistently related to the degree of democracy" (*Lipset, S. M., pp. 78-79, Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, The American Political Science Review, Vol. 3, No. 1, 1959).*

শিক্ষা মানুষের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে এবং চরমপন্থা থেকে বিরত থাকতে এবং যৌক্তিক ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতে/নির্বাচিত করতে সহায়তা করে। তবে "Education is virtually a necessary condition for the emergence and stability of democracy. Education is not however, a sufficient condition" (*Lipset, S. M., 1995, The Encyclopedia of Democracy, Routledge, London, p. 389*)। লিপসেট এক্ষেত্রে চীন, সিঙ্গাপুর, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, লিবিয়া, ইরাক, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উদাহরণ দিয়ে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শিক্ষাই গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত হলেও, একমাত্র শর্ত নয়।

ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি একটি দেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, রাষ্ট্র/সরকারের উন্নয়াভিমুখী লক্ষ্যমাত্রা, রাষ্ট্রের মূলনীতি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রভৃতির নিরিখে নির্ণীত হয়। তবে গণতান্ত্রিক সমাজের সকল সদস্য একই স্তর ও মানের শিক্ষা গ্রহণ করে না। শিক্ষার স্তর ও মানের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের জন্য নিদেনপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন জরুরি। তবে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ শ্রেয়তর। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে নেতৃত্ব দানকারী মানুষের যেমন প্রয়োজন রয়েছে একইভাবে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিচারক, উকিল, প্রশাসক, বিজ্ঞানী, গবেষক প্রভৃতিরও প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের পেশাজীবীদের সাধারণ উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারী হতে হয়। আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনকারীগণ লিখতে, পড়তে এবং হিসেব নিকেশ করতে পারেন। এ ধরনের শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মধ্য থেকে সাধারণত বিজ্ঞানী, বিচারক সৃষ্টি না হলেও এরা সকলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট দান করেন এবং রাজনৈতিক দল ও ভোট প্রার্থীদের প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। অর্জিত শিক্ষার ফলে তারা ভোট প্রার্থীদের প্রচারপত্র, পোস্টার, তথ্য, অঙ্গীকার, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন, তদনুসারে নিজেদের ভোট দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অন্যদেরও প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্নকারীদের চুয়ান্নটি জনমত জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্পর্কে "The more education these Americans had received, the more knowledge they had on almost all subjects. This was true of young and old people alike, when compared with others in their age group. ... the better educated were more knowledgeable about events that had happened long after they had graduated" (*Ibid, pp. 389-390*).

এভাবে যারা পড়া-লেখা করেন, তাদের মাঝে শিখনের অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং সংবাদপত্র, সাময়িকী, পুস্তক প্রভৃতি থেকে তাঁরা জ্ঞান আহরণ করেন, অধিক তথ্য সংরক্ষণে সমর্থ হন এবং এ তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে আজীবন। এভাবে সামর্থ্য, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা সভা, সংঘ, সমিতি প্রভৃতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন। স্বল্প শিক্ষা অর্জনকারীদের তুলনায় অধিক শিক্ষা অর্জনকারীরা নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনে অধিক হারে অংশগ্রহণ করেন এবং কোন দাবিনামায় স্বাক্ষর করেন, মানুষের জন্য দান করেন, রাজনৈতিক প্রচারণায় কোন নির্দিষ্ট প্রার্থী বা দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন এবং ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, "In the Canadian federal election of 1988, about 86 percent of those with no more than high school education voted, whereas 90 percent of those with some university or technical school education and 94 percent of those with a graduate degree voted. ... Even a few years of elementary schooling confers certain skills, and skill brings confidence and an enhanced sense of political efficacy" (*Ibid, p. 390*).

তবে যারা শুধু পড়তে এবং লিখতে পারেন তাদের মাঝে (ব্যতিক্রম ছাড়া) সমালোচনামূলক চিন্তার (Critical thinking) বা সম অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে না। উচ্চ শিক্ষাই সাধারণত: মানুষের চিন্তা-চেতনার অধিকতর বিস্তৃতি ঘটিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হতে প্রভাবিত করে। সাধারণত: মানবিক বিষয়ে (Liberal arts) শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই তুলনামূলকভাবে কারিগরি/প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জনকারীদের চেয়ে অধিক হারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য পরিবেশেও শিক্ষা অর্জনকারীগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। শিক্ষা অর্জনকারী বয়স্করা জীবনব্যাপী কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা/দক্ষতা অর্জন করেন। আলোচনা ও ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে, গণমাধ্যম (পত্রিকা, রেডিও, টিভি প্রভৃতি), সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের (ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি) সহায়তায় জ্ঞানার্জন করেন। অবশ্য গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভুল তথ্য প্রদান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপকৃত এবং উজ্জীবিত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, "Education increases the society-wide support for democracy because democracy relies on people with high participation benefits for its support. Better educated nations are more likely both to preserve democracy and to protect it from coups'. (*Edward I. G. et. al; 2006, Why does democracy needs education? (http:// www.nber.org/papers/w12128, Cambridge, p. 31*)

শিক্ষা ও সাহিষ্ণুতা

গণতন্ত্রের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো- সহিষ্ণুতা (Tolerance)। শিক্ষা অর্জনের সাথে মানুষের সহিষ্ণুতায় কোন প্রভাব পড়ে কিনা বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। মানুষের মতামত গ্রহণ করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান মানুষের মাঝে পরমতসহিষ্ণুতাসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ড নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। এতে বিভিন্ন দেশ থেকে মতামত সংগৃহীত হয়েছে। এতে নৃতাত্ত্বিক বা বর্ণগত ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী, একদলীয় ব্যবস্থা, বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা হয়। দেখা যায় যে, "The most

important single factor differentiating those giving democratic responses from others has been education. The higher one's education, the more likely one is to believe in democratic values and support democratic practices" (*Lipset S. M., 1959, p. 79*)

শিক্ষার সাথে ভিন্নমত, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, রাজনীতি প্রভৃতির সহিষ্ণুতা সম্পর্কে ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে ১৯৮৪ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের General Society Survey data ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, "Strong positive effects of education on a multiple target group tolerance scale that included both left-wing and right-wing groups. A substantial fraction of the education effect on tolerance is mediated by cognitive sophistication. The effects of education on tolerance are strong even when a person has negative feelings toward the target group" (*BOBO L. et. al., 1989, Education and Political Tolerance: Testing the Effects of Cognitive Sophistication and target group affect, in public opinion quarterly, vol. 53, no. 3, University of Chicago, USA, p. 285*)

এছাড়া ২০১৩/১৪ সালের Education for all Global monitoring report প্রকাশের লক্ষ্যে ইউনেস্কো- শিক্ষা, গণতন্ত্রায়ন, নানাবিধ সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক উপলব্ধির উপর গবেষণা পরিচালনা করে। এতে পৃথিবীর ৬টি অঞ্চলের উন্নয়নে উত্তরণরত (Transition) সমাজের ৩০টি বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের নমুনা নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। উচ্চ মধ্যম, নিম্ন মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের ৩০টি দেশ থেকে উক্ত নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। উপর্যুক্ত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে,

"Educational attainment tends to be positively associated with higher levels of tolerance towards people of a different race and religion, those who speak a different language, immigrants,... educational attainment has a substantial positive effect on political engagement and interest in politics in every region. Higher educated citizens are also more likely to understand democracy in terms of free elections, civil rights, gender equality and economic prosperity" (*UNESCO, 2013, Education and democratisation: tolerance of diversity, political engagement, and understanding of democracy. p. 20*).

শিক্ষা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

শিক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারীরা লিখতে, পড়তে ও গণিতের/হিসাবের সাধারণ দক্ষতা অর্জন করে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকারীরা মূলত: কলকারখানা বা অন্যান্য পেশায় কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এদেরকে নীল রংয়ের (Blue-collar) পেশাজীবী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা সাধারণত জনসভায় জনগণ হিসেবে উপস্থিত থাকে (ব্যক্তিক্রম ছাড়া)। তবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অর্জনকারীরা সংবাদপত্র, সাময়িকী, পুস্তক প্রভৃতি পড়তে পারার কারণে এগুলোর বাজার সৃষ্টি হয়। এ বাজারে রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, আলোচক, সমালোচকদের এবং বুদ্ধিজীবীদের বিতর্ক/ সমালোচনা/সমর্থনমূলক লেখাসমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যম বা মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারীগণ এভাবে অর্থনৈতিক চিন্তা চেতনা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতায় উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়। তবে এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত। ইতিহাসে একথা প্রমাণিত যে, "রাজনীতি হলো অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ"। অর্থাৎ রাজনীতিতে মানুষের যেসব চাহিদার কথা বলা হতে পারে তাহলো– মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়। যেমন- শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, বোনাস বা উৎসব ভাতা প্রদান, সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা উন্নতকরণ, খাদ্যের বা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধকরণ, শিক্ষা অর্জন নিশ্চিতকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ বা হ্রাস, মঙ্গা, দুর্ভিক্ষ বা চরম খাদ্যাভাব দূরীকরণ প্রভৃতি। মানুষের মাঝে যদি শিক্ষা থাকে তাহলে তারা গণমাধ্যম, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের আলোচনা/সমালোচনা প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাদের অর্থনৈতিক, মানবিক চাহিদার পক্ষে জনমত গঠন করতে পারেন। তবে

এক্ষেত্রে অবশ্যই গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত থাকবে। প্রশ্ন উঠতে পারে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরে গণতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক উন্নয়ন হলো কিভাবে? এক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন মনে করেন যে, উল্লিখিত দেশসমূহে উন্নয়নের জন্য "Helpful Policies" বা সহায়ক নীতিসমূহ গৃহীত হচ্ছে। এসকল সহায়ক নীতিসমূহের মধ্যে রয়েছে– "Openness of competition, the use of international markets, a high level of literacy and school education, successful land reforms and public provision of incentives for investment, exporting and industrialization" (*Sen A., 1999, Development as Freedom, Oxford University Press, New Delhi, India, p. 150*)

অমর্ত্য সেন-এর মতে, উল্লিখিত নীতিসমূহ কর্তৃত্ববাদী (Authoritarian) শাসকদের দ্বারা গৃহীত হলেও বৃহত্তর গণতন্ত্রের সাথে এসব নীতির কোন বিরোধ নেই। একারণেই উল্লিখিত দেশসমূহে শাসকদের সাথে জনগণের ব্যাপক কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত নীতিসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো উচ্চ স্তরের/মানের সাক্ষরতা ও স্কুল শিক্ষা যা জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কে অনুধাবন, বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে। কাজেই গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র ভোট প্রদান, সমালোচনা করার অধিকার, প্রতিবাদ করার সুযোগ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আরো বিস্তৃত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিতর্ক, গণআলোচনা, প্রস্তাবনা, কোন বিষয় গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে জনমত তৈরিকরণ, সামাজিক-রাজনৈতিক-বিচারিক পরিবেশগত বঞ্চিতকরণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া বা মতামত সৃষ্টি করা, লিঙ্গ-অসমতা দূরীকরণ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এসকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের দায়িত্বশীল ভূমিকা অপরিহার্য।

শিক্ষা গণতান্ত্রিক উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হলেও এটাই গণতান্ত্রিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার একমাত্র নির্ধারক নয়। তবে কোন দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী শিক্ষা অর্জন করলে সে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশলীতা বিরাজমান থাকার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২

ক. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুনঃ

১. অমর্ত্য সেন রাষ্ট্রের উন্নয়ন, স্থিতিশলীতায় শিক্ষার অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
২. সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের একমাত্র শর্ত।
৩. কর্তৃত্ববাদী শাসকদের সহায়ক নীতির সাথে বৃহত্তর গণতন্ত্রের বিরোধ নেই।

সঠিক উত্তরঃ ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
২. Public Reasoning বলতে অমর্ত্য সেন কী বুঝিয়েছেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? গণতান্ত্রিক উন্নয়নে শিক্ষার অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করুন।
২, মানুষের সহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।